বীরভূমের ইতিহাস প্রসঙ্গে

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
(দ্বিতল) কলিকাতা-৯

পুরুষোত্তমকে

দু-চার-কথা

কোন একটা জেলা সম্পর্কে জানার আগ্রহ মানুষের থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলোর অবস্থান এক রকম নয়। গঠন, ভূ-প্রকৃতি সবই আলাদা। এই জেলা সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছুই জানতে চায়। বীরভূম জেলার মধ্যে এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যার আকর্ষণ চিরন্তন বা এমন কিছু কিছু আবিষ্কৃত তথ্য আছে যার মূল্য অনেক।

বীরভূম জেলার আয়তন খুব বেশী না হলেও খুব ছোট জেলা নয়। এই জেলার মধ্যে রয়েছে সতীপীঠ, বিশ্বকবির শান্তিনিকেতন, বামদেবের তারাপীঠ। এই সব কিছুর উপর আলোকপাত করেছি।

এক সময় বীরভূম জেলা ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সাধারণত আদিবাসীদেরই বাস ছিল বেশী। তারা এই জঙ্গলকে বলত 'বির'। অনেকের ধারণা এই বির থেকেই বীরভূম। তাছাড়া বীরভূমে বীরদের আগমন, এই বীর থেকে বীরভূম কথাটা এসেছে এরকম ধারণাও ভুল নয়। আমাদের ফেলে-আসা জীবন কেমন ছিল। কি ভাবে নামকরণ হল এ রকম কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। Past is golden অর্থাৎ অতীত স্বর্ণময়, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের জয়যাত্রা। মানুষ সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে সংঘবদ্ধ হয়। তারপর সৃষ্টি হয় সমাজ। ক্রমে ক্রমে গ্রাম, শহর, রাজ্য, রাষ্ট্র, উন্নতির পর উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। এর জন্য অনেক শ্রম, প্রকৃতির অবদান প্রয়োজন। একটা জেলা গড়ে ওঠে মানুষ, মাটি, জঙ্গল, নদী প্রভৃতি নিয়ে। এর পর শাখা-প্রশাখা। মানুষ তার বাঁচার তাগিদে, টিকে থাকার তাগিদে, সুষ্ঠু জীবনযাপনের তাগিদে সৃষ্টি করে সঙ্গীত, নাটক, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি। সংস্কৃতিতে আনে পরিবর্তনের চেতনা। মানুষের মধ্যেও আবার সৃষ্টি হয় জীবন-সংগ্রাম, সংঘর্ষ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এরপর দিন চলতে থাকে। ফেলে-আসা দিনগুলো থেকে আসে বর্তমান, তারপর ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। ভবিষ্যৎ দ্বার প্রান্তে এলে বর্তমান হয় অতীত।

এই অতীতকে জানতে মানুষকে শরণাপন্ন হ'তে হয় ইতিহাসের কাছে। ইতিহাস সত্যের ধারক ও যুগবাহক।

বীরভূমের আয়তন এক সময় বিশাল ছিল। এখন বীরভূম ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত। বীরভূমের মাটি মূলত তিন রকমের। কাঁকুরে, এঁটেল এবং বেলে। এর কারণ বীরভূমের অবস্থান, বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে পাথর আছে। পাথরের ঢালু অংশ মূলত কাঁকুরে। নদীর অববাহিকা অঞ্চল মূলত বেলে। মাঝখানে কিছু অংশ এঁটেল। এছাড়া আরও কিছু কিছু অংশে কাঁকুরে মাটি দেখা যায়। বীরভূমে চাষই প্রধান উপজীবিকা। কৃষিযোগ্য জমি এখানে যথেষ্ট আছে। তাই বীরভূমের সংস্কৃতি কৃষিজ। সংস্কৃতিতে আবার 'লোক' কথাটি ব্যবহার আছে। আমরা যদিও বলেই থাকি লোকগীতি, পল্লীগীতি, লোকসাহিত্য কিন্তু সবই তো লোকের। লোক বলতে যদি নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর লোক বোঝায় তাহলে হয়ত ঠিক আছে। না হলে বিষয়টি বিতর্কের। আমি যদিও লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বীরভূমে লোকসংগীতের বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। লোকসংগীতে সাধারণত অপ্রচলিত শব্দের ঝঙ্কার শোনা যায়। যার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাব নেই। মূলত কমার্সিয়াল, এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রচলিত কথাটি। প্রচলিত বলতে কোন এক সময় থেকে মানুষের মুখে মুখে এসেছে। এর নির্দিষ্ট কোন রচয়িতা নেই।

'কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে সাধারণ এর সম্পত্তিতে পরিণত হয়'। অথচ বীরভূমে অসংখ্য লোকগীতিকার এখনও জীবিত এবং তাঁরা গান লিখে যাচ্ছেন, লোকসংগীতকার এখন আছে তখনও ছিল। ইতিহাস শুধু ধরে রাখতে পারেনি। এখন সেই কাজ শুরু হয়েছে। লোকসংগীতকারদের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। প্রচলিত শব্দটিকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতকে খোঁজার চেষ্টা ভাল। বীরভূমের মাঠে যারা গরু ছাগল চরাতে যায়, তাদের মধ্যেও কারও কারও প্রতিভা আছে। তারা বেশ কিছু অপ্রচলিত অশ্লীল কথা দিয়ে গান রচনা করে। কিন্তু তাদের লেখার ক্ষমতা নেই। কণ্ঠে সুর আছে। বর্তমান লোক সংগীতকাররা তাদের কাছে ঋণী। তবে আপত্তি থাকা স্বাভাবিক

লোক আঞ্চলিক কথা শোনাতে। লোক বলতে খুব নিম্ন বর্ণকেই আমরা বুঝি, আঞ্চলিক শব্দটিও সীমাবদ্ধ। কিন্তু লোক বা আঞ্চলিক সব কিছুই সীমানা পেরিয়ে যেতে পারে প্রতিভার জোরে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে লোক-সাহিত্যে বা সংগীতে সর্বসাধারণের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তেমনি বীরভূমে এমন হয়ত কেউ জন্মগ্রহণ করবেন যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে হয়ত লোক নাম সংকীর্ণ শব্দটি সর্বজনগ্রাহ্য হবে।

বীরভূমের বাউল-এর টানও প্রবল। বিশ্বকবি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। বৈষ্ণবীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরাকার ব্রহ্মের স্বাদ পেয়েছিলেন লালনগীতিতে। বীরভূমের বাউলের সুর এখন সারা বিশ্বে।

বীরভূমের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভাব প্রবল, বর্তমানে আধুনিক প্রভাবে ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হলেও, মানুষ যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঘাটতি আসে নি। বরঞ্চ competition বেড়ে গেছে, পরে অনুষ্ঠানে এসেছে আভিজাত্য। এখানে সার্বজনীন উৎসবের পাশে পাশে আছে লৌকিক দেব-দেবী পূজা। বীরভূমের ধর্মরাজ, মনসা, ইতু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পূজা বেশ ঘটা করেই হয়। তবে সর্বত্র না হলেও কোন কোন জায়গায় হয়। এর পিছনে যেমন ধর্মীয় গতানুগতিক প্রথা আছে তেমনি আছে কিছু আদি স্থানীয় মানুষের আগ্রহ। Religious Development ব্যতীত মানুষের চৈতন্যের বিকাশ ঘটে না। মানুষের মন যখন ধর্মের কাছে—ঈশ্বরের কাছে নত হবে, তখন অন্যায় কাজে ভয় আসবে। যতই চিৎকার চেঁচামেচি করা যাক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এর সমাধান শুধু Religious Development বা ঈশ্বরের কাছে, গড বা আল্লার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা। বীরভূমের মানুষদের কাছে ধর্ম একটা বড় বিষয়। ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থা আছে। এখানে হিংসার প্রভাব কম। হিংসা বলতে হিংস্রতা—খুন জখম কম হয়। তার কারণ কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া এখানে কম। Industrial এলাকায় মানুষের Culture অন্য রকম হয়।

বীরভূমে বৈষ্ণবীয় আবহাওয়ায় মানুষ অনেক বেশী সহনশীল।

[আট]

শিল্পে বীরভূম তেমন উন্নত নয়। শিল্প বলতে বড় বড় Industry এখানে গড়ে ওঠেনি। তবে পর্যটকদের কাছে বীরভূমের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন, তারাপীঠ, নলহাটী, কঙ্কালীতলা, সাঁইথিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জায়গাগুলো গড়ে ওঠার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। যার আলোচনা করা হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-এর আকর্ষণ সর্বাধিক।

বীরভূমের এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেমন দেবীদহ, শিব পাহাড়ী, আগমবাগিশের সমাধি ক্ষেত্র যা আজও মানুষের অজানা, অচেনা। ইতিহাসের পাতায় এদের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু যে ইতিহাসে এই সমস্ত জায়গার উল্লেখ আছে তা প্রকাশ্যে আসতে অক্ষম। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিস দেহ রাখেন এই বীরভূমে। বামদেব, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি এঁরা সকলেই বীরভূমের মাটিতে অমর হয়ে আছেন। তাই বীরভূম ধন্য। এঁদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সকলের। হয়ত কয়েকজন জানেন। সর্বজন সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো দরকার।

বীরভূমের সমাজে আলকাপের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সাধকদের যেমন আছে বীরভূমে বিশেষ স্থান তেমনি নিম্ন বর্ণের বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে আলকাপ বিশেষ জনপ্রিয়। বীরভূমে অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রভাব সর্বাধিক। কারণ তাদের মন যুক্তিবাদী নয়—সরল। তেমনি সারাদিনের শ্রমের পর রসাত্মক কিছু বড়ই মজাদার। তবে আলকাপ আর আগের মতো নেই। অর্থাৎ অশ্লীল রসের আধিক্য অনেক কমে এসেছে। এর প্রধান কারণ মানুষ ক্রমে সভ্য হচ্ছে। আলকাপের সব চাইতে বড় গুণ সম্প্রীতি। দুই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা একই সঙ্গে বসে বসে রস উপভোগ করে। ভুলে যায় ভেদাভেদ। বীরভূমে কোন পুজো উপলক্ষে উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা আলকাপের আয়োজন করে। যে সমস্ত মানুষেরা বেশী স্পর্শকাতর তাদের মধ্যে আলকাপ ঐক্যের বীণা।

বীরভূমের সংস্কৃতিতে ভাদু গানের একটা বিশেষ ভূমিকা

আছে। কৃষিকার্য শেষ হলেই ভাদ্র মাসে ভাদু গানের দল গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে পড়ে। গ্রাম ছাড়িয়ে আজকাল শহরেও ভাদু গানের দারুণ চল। ভাদু গান সাধারণত শ্রমজীবী মানুষরাই করে।

কবি গানেরও প্রভাব বীরভূমে কম নয়। এক সময় বিশেষ করে জমিদারী আমলে কবির লড়াই জমে উঠত। মানুষের সময়ের মূল্য এখন দারুণ। দীর্ঘক্ষণ ধরে কবি গান শোনার মতো সময় মানুষের নেই। সেই জন্য কবির আসর এখন কম বসে। দ্বিতীয় Video-এর পর্দার পাশেই মানুষের ভীড় বেশী। তারপর গ্রামে-গঞ্জে Video, T.V.-এর জন্য কবি বা ভাদু গানের প্রতি মানুষের স্পৃহা কমে এসেছে। তবে মূল্য কমে নি। বরঞ্চ বেড়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের কাছে এই সমস্ত গান খুবই প্রিয়। Video বা T.V.'র স্রোত বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু কবি বা ভাদু গান চিরকালের।

বীরভূমে নাট্য আন্দোলন যদিও শহরকেন্দ্রিক, তবুও নাটকের মূল্য গ্রামের মানুষও বোঝে। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যাত্রার প্রভাব খুব বেশী। মহিলা ভাড়া করে এনে গ্রামের ছেলেরা খোলা মঞ্চে যাত্রাভিনয় করে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ না থাকার কারণ হল নাটকের জটিলতা। অর্থাৎ নাটক মঞ্চস্থ করার মত দক্ষ পরিচালকের অভাব। বীরভূমের শহরে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো সমানে নাটক পরিবেশন করছে। কোন কোন গোষ্ঠী কলকাতা বা বীরভূমের বাইরেও নাটক পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছে। বীরভূম নাট্য আন্দোলনে পিছিয়ে নেই।

বীরভূমের সেচ ব্যবস্থাও ভাল। দুটো জলাধার থেকে কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া হয়। ফলে উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এই সেচ কার্যের ফলে নদী দুটো নাব্যতা হারাতে বসেছে। যার ফলে বন্যার আশঙ্কা আছে। আর প্রয়োজন নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য চরা কেটে ফেলা এবং মাঝে মধ্যে জল সরবরাহ করা।

সাক্ষরতা আন্দোলনে বীরভূমের সাফল্য আশাতীত। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ

মানুষের সহযোগিতায় বীরভূম এখন সাক্ষর জেলা। এই আন্দোলনের সুফলে বীরভূমবাসী খুশী।

সর্বোপরি এই পুস্তক রচনায় সহযোগিতা করে আমার কয়েকজন শিক্ষক এবং বন্ধু আমাকে ঋণী করেছেন। আমি তাঁদের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞাচিত্তে স্মরণ করি। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় মহাশয় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সহযোগিতা করেছেন উক্ত গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

'সাহিত্যশ্রীর' প্রকাশক মাননীয় তপন ঘোষ মহাশয় বার বার এসে আমাকে তাগাদা দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। আমি একজন সামান্য লেখক। ইতিহাস লেখার কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু তপন বাবুর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় আমি এ কাজে হাত দিই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার এই বইটি প্রকাশ করেছেন। তপন বাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জানি না পাঠকের সমালোচনার ভার কতটা বইতে হবে।

তাঁদের মন্তব্যই আমার একমাত্র পারিশ্রমিক।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৪

বিনীত

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

নামকরণ

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাঙা মাটির বীরভূমে দীর্ঘদিন বসবাস করে বুঝেছিলেন যে, মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে বাউলের সুর, ভাদুর নাচ, কবির লড়াই, আর শান্তির ললিত বাণী। তাই তিনি জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তৈরী করলেন বিশ্বভারতী। বীরভূমের সব চাইতে বড় গর্ব আজ শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী।

আলোচনাটা যেখান থেকে শুরু হবে সেটা হচ্ছে এই 'বাউলের' বীরভূমের নামকরণ কিভাবে হল।

বীরভূমের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মত প্রচলিত। তবে বীরভূম শব্দটা উচ্চারণের সময় একটা 'বীরে'র নাম উচ্চারণ করতে হয়। অর্থের দিকে গেলে দেখা যাবে 'বীর' শব্দের অর্থ শক্তিশালী ব্যক্তি। আবার আদিবাসী সাঁওতালদের ভাষায় 'বির' শব্দের অর্থ জঙ্গল। সাঁওতালরা জঙ্গল বা বনভূমিকে বলে 'বির'। বীরভূম একদা ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল! তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখন বীরভূমের বিশাল অংশ জুড়ে আছে বনভূমি। এই বনভূমিতে মূলত সাঁওতালরাই বসবাস করত। সুতরাং ধারণাটা ভুল নাও হতে পারে যে, 'বির' শব্দ থেকে বীরভূম নাম হয়েছে।

চন্দ্র বংশীয় বলি রাজার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়, যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র।

অঙ্গ বলতে ভাগলপুর অঞ্চল, বঙ্গ—বাংলা (অবিভক্ত বাংলার কিছু অংশ) কলিঙ্গ—যাজপুর অঞ্চল, সুহ্ম—রাঢ়দেশ, পুণ্ড্র—মালদহ।

"অঙ্গোবাঙ্গা কলিঙ্গশ্চ, পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চতো সুতাঃ
তেষাং দেশঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি।"

[মহাভারত আদিপর্ব]

'বঙ্গদেশ' বলতে অবিভক্ত বাংলার কিছু অংশকেই বোঝায়। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর জুড়ে ছিল বিশাল অঙ্গ দেশ। দেশ বিভাগের পর ভাগীরথীর পূর্ব-পশ্চিম দিক বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাভারতের বীর কর্ণ দীর্ঘদিন অঙ্গ দেশে বসবাস করেছিলেন। ভীমরা যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন; কথিত আছে তখন তারা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটা ঘন জঙ্গলে বসবাস করতেন। জায়গাটা মোটামুটি বীরভূমের অন্তর্গত কোটাসুর। কোটাসুর থেকে বীরচন্দ্রপুর এই বিশাল বনভূমি ছিল তাঁদের বিচরণক্ষেত্র : খুবই সাধারণ ভাবে তাঁরা জীবন যাপন করতেন। সেই সময় ঐ এলাকায় কুখ্যাত বক নামে এক রাক্ষস বাস করতেন। তাঁকে সকলেই ভয় করতেন, ভীমের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয় কোটাসুরের অদূরে কামারহাটি নামে একটা জায়গায়। ভীমের হাতে রাক্ষস মারা যান। ফলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে! এবং ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটি যে ভীম এটাও সকলে জেনে ফেলেন, তাঁর এই বীরত্বের জন্যই জায়গাটার নাম হয়েছে বীরভূম।

ম্যাসিডনের অধিপতি দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দার ভারত অভিযান করেছিলেন। তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্রই ঘুরে বেরিয়েছিলেন। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেও ঘুরেছিলেন। তার কারণ তাঁর বর্ণনায় যে "গঙ্গারিঢ়ি"-র নাম পাওয়া যায় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়। দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দার বীরভূমেরও বেশ কিছু অংশ পরিদর্শন করেন। রাঢ় বাংলা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

মল্লরাজগণ মান সিংহ, বীর, ধরা, বল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে রাজত্ব করতেন। বীর নামধারী রাজার দায়িত্বে ছিল এই বিশাল বীরভূম এলাকা। তাঁরই নামানুসারে তিনি এই এলাকার নামকরণ করেছিলেন 'বীরভূমি'। যা বর্তমানে বীরভূম নামে পরিচিত।

গৌরহর মিত্রের 'বীরভূমের ইতিহাস' থেকে জানা যায় প্রায় সাত-আটশ' বছর পূর্বে বীর সিংহ এবং চৈতন্য সিংহ এই বিশাল এলাকায় রাজত্ব করতেন। সিউড়ী থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে বীরসিংহ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি জঙ্গলবাসীদের

পরাজিত করে তাঁরই নামানুসারে এলাকার নাম করেন বীরভূম, বীরসিংহ ছিলেন রাজা জরাসন্ধের বংশধর।

বহু পূর্ব থেকে বীরভূমে 'লড়িয়া' বা 'লড়াকু' ব্যক্তিদের সমাবেশ হয়। বর্তমান সভ্যতার যুগে 'লড়াই'টা কিছুটা কমে গেছে। আরকাঁটা বেঁধে শুরু হতো লড়াই। প্রতিযোগিতা-মূলক লড়াই। এই লড়াই-এ যে জিততো তাকে সকলেই 'বীর' বলে সম্বোধন করত। অর্থাৎ সে বীর্যশালী ব্যক্তি। তবে বেশীর ভাগ বীর্যশালীরাই বীরভূমের। তাই বীরভূমের নামকরণ এই বীরদের প্রভাবেই হয়েছিল বলে ধারণা।

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এই বীরভূমের নাম আছে। এই বীরভূমে অনেক বড় বড় মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং অনেক বড় বড় মনীষীর আগমনও ঘটেছে। তাঁদের প্রভাব এই এলাকায় পড়েছে। এই জন্যেই আকর্ষণ করেছে অনেক পর্যটককে। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণে এই রাঙা মাটির দেশের কথা আছে। বীরভূমের রাঙা মাটির টান সুদূরপ্রসারী। শান্ত নির্জন প্রান্তে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের সমাবেশ ঘটেছে। সাধারণত বিবাদপূর্ণ জায়গায় বা কলকারখানার মাঝে বৈষ্ণবীর আখড়া গড়ে ওঠে না। বীরভূমের আবহাওয়া তাই 'পরকীয়া' প্রেমের উপযোগী।

রাঙা মাটির বীরভূম আবার এঁটেল মাটি, পলি মাটিরও বীরভূম। বীরভূমের গঠন ঠিক একভাবে হয় নি। যেমন, শক্তি সাধনার পীঠস্থান, তেমনি বাউল-বৈষ্ণবদের বিচরণভূমি। বীর-ভূমের উদারতার সুযোগ সকলেই গ্রহণ করেছে। সাঁওতালদের তীরের আঘাত যেমন সহ্য করে, তেমনি সর্ব ধর্মের মানুষকে কোলে নিয়ে অহিংসার বাণীও ছড়ায়। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে মহাবীর এই রাঢ় অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বীরভূমে এখন জৈন ধর্মের অনেক মানুষ বাস করেন। জৈনদের ধারণা মহাবীরের নাম অনুসারেই বীরভূম নামকরণ হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বীরভূমে সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত। প্রস্তর নির্মিত নানান অস্ত্র-শস্ত্র দেখে বোঝা যায়,

সৃষ্টিশীল মানুষ বীরভূমে ছিলেন। এই থেকে অনেকের অনুমান কোন প্রতিভার প্রভাবেই বীরভূমের নামকরণ করা হয়েছে। যদিও কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তাই কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেই। বীরভূমের নামটা এখনও অনুমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুটি বিষয় এখন খুবই স্পষ্ট—একটা হল "বির" আর একটা হল "বীর"। হয় জঙ্গল থেকে না হয় বীরত্ব থেকে। তবে আদিবাসীদের কথা থেকেই বীরভূম নামকরণ হয়েছে বলে বেশী ভাগ গবেষকের ধারণা।

অবস্থান ঃ সীমানা ঃ জলবায়ু

বীরভূম জেলার ইতিহাস পড়লে বোঝা যার আজকের বীরভূম আর ২৫০ বছর আগের বীরভূম সম্পূর্ণ আলাদা।

যখন মুসলিম শাসকগণ রাজত্ব করতেন তখন বীরভূমের আয়তন ছিল ৩,১১,৪৪৬ বর্গ মাইল। বীরভূম রাজ্য তখন পূর্বদিকে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমদিকে রামগড় ও মুঙ্গের উত্তরে ভাগলপুর এবং দক্ষিণে বর্ধমান ও পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বীরভূম রাজ্য তখন ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সাঁওতাল পরগণাও বীরভূম থেকে বেরিয়ে বিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমান বীরভূম একটা ছোট্ট জেলা। নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শাসনের সুবিধার জন্য বীরভূমকে ছোট করা হয়েছে।

বীরভূমের পশ্চিম এবং উত্তরের বেশ কিছু অংশে সাঁওতাল পরগণা।

পূর্বদিকে মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণে বর্ধমান। বর্তমানে বীরভূমের তিনটি মহকুমা এবং ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত। বীরভূমের জলবায়ু খুব উষ্ণ, শুষ্ক নয়। এখানে যেমন শীত, তেমনি গ্রীষ্ম। রাজনগর বা মল্লারপুরের পশ্চিমাংশে জঙ্গল। গ্রীষ্মকালে জলের অভাব দেখা দিলেও পূর্বাঞ্চল শস্য-শ্যামল। বীরভূমে বর্ষা মূলত জ্যৈষ্ঠের শেষ বা আষাঢ়ের প্রথমেই শুরু হয়।

M.S. Sherwill ১৮৪৯—৫২ খ্রীষ্টাব্দে যখন জরিপ করেন তখন জেলার পরিমাণ ছিল ৩১১৪৪৬ বর্গ মাইল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ্ রেভিনিউ-এর আদেশ মত বীরভূম হতে বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরের জমিদারী বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৮৩৫—৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বীরভূম মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে পাল রাজাদের হস্তগত হয়।

বীরভূমের পটপরিবর্তন হয়েছে সব সময়েই। ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বীরভূম বর্তমানে উত্তর রাঢ় ভূমির অন্তর্গত।

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীর দেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ় দেশ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

খাজোরাহো লিপি এবং বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্র শাসনে এই রাঢ় দেশের উল্লেখ আছে। বাঁকুড়ার চন্দ্রবর্মার শিলালিপিতে রাঢ়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরে এই রাঢ় দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়—**উত্তর** রাঢ় ও **দক্ষিণ** রাঢ়।

"বীরাভূঃ কামকোটি স্যাৎ প্রচ্যেৎ গঙ্গাজয়ান্বিতা।
আরণ্যকঃ প্রতীচ্যাঞ্চ দেশে দার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্য পাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহবঃ স্থিতাঃ।"

এক নজরে বীরভূম (১৯৯২ খ্রীঃ)

বীরভূম জেলার আয়তন—৪৫১৩ বর্গ কিঃ মিঃ, মহকুমা—৩টি সিউড়ী, বোলপুর এবং রামপুরহাট।

মোট মৌজা—২৪৩৬
মোট গ্রাম— ২৪৮৯

[বীরভূমের অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে একটি মৌজায় দুটি করে গ্রাম গড়ে উঠেছে]

মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা—১৬৯

পৌর প্রতিষ্ঠান—৫

[সিউড়ী, রামপুরহাট, বোলপুর, দুবরাজপুর এবং সাঁইথিয়া]

গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়— ২,৯৯৪

জুনিয়ার হাইস্কুল— ১১০

মাধ্যমিক স্কুল— ২৫৫

পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়— ৯

প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়— ১৯

জেলা গ্রন্থাগার— ১টি

শহর „ — ৯টি

মহকুমা „ — ১টি

গ্রামীণ „ — ১০৯টি

হাসপাতাল—জেলা— ১টি

মহকুমা— ২টি

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—১৯ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র—৪২

ব্লক অফিস—১৯টি

থানা—১৭টি

বিশ্ববিদ্যালয়—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

মহাবিদ্যালয়—১০টি

লোকসংখ্যা—(১৯৯১ আদম সুমারী)—২৫,৬০,৪৯৮ জন

তপশীল পুং ঃ—৪,০৩,৪৭৩ জন মহিলা—৩,৭৯,১১০ জন

উপজাতি পুং ঃ—৯০,৮৩৫ মহিলা—৮৭,৯৯০ জন

মোট চাষযোগ্য জমি—১১,১৫,০০০ একর (আনু)

বীরভূমের মাটি ও নদ-নদী

বীরভূমের মাটি সর্বত্র এক নয়। তার কারণ বীরভূমের কোন জায়গা উঁচু কোন জায়গা নিচু। সাঁওতাল পরগণার পর থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। ফলে বীরভূমের পশ্চিম এবং উত্তর দিক উঁচু এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিক নিচু। ফলে দেখা যাচ্ছে বীরভূমের পশ্চিম এবং উত্তর দিকের মাটি পাথুরে। পশ্চিম এবং উত্তর দিক থেকে

মাটি ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সেই হেতু নদীগুলিও পূর্ব এবং দক্ষিণবাহিনী। বিহার সংলগ্ন এলাকাগুলো যেমন, গনপুর ডেউচা প্রভৃতি জায়গার মাটিতে কাঁকরের ভাগ বেশী। সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেই। ধান চাষ খুব একটা ভাল হয় না। তবে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকায় কৃষিকার্য ভাল হয়। ময়ূরেশ্বর লাভপুর, রামপুরহাট থানার কিছু অংশে কৃষিকার্য ভালই হয়। যে এলাকার জমি এঁটেল মাটি দ্বারা গঠিত সেই সব জায়গায় ধান খুবই ভাল হয় এবং যে সমস্ত জায়গাগুলো কোন নদীর ধারে অবস্থিত সেই সব জায়গায় মরশুমে ভাল ফসল হয়। ময়ূরেশ্বর থানার ষাটপলশা অঞ্চল। এছাড়া কুণ্ডলা, কোনাসুর, রামনগর প্রভৃতি এলাকা এবং দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত কামড়া, তাগেয়া প্রভৃতি গ্রামগুলোতে পলি মাটি দেখা যায়। এই পলি মাটিতে কপি, মূলা, আলু প্রভৃতি ফসলের চাষ খুবই ভাল হয়। আবার নলহাটি বা দুবরাজপুরে এলাকায় উঁচু-নিচু পাহাড়ও দেখতে পাওয়া যায়। ফলে বীরভূমের সর্বত্রই সমভূমি নয়, সমভূমিতে তিলপাড়া ব্যারেজ এবং ডেউচা ব্যারেজ (জলাধার) থেকে কৃষিকার্যে সেচ দেওয়া হয়।

ময়ূরাক্ষী—ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূমের 'জীবন'। তার কারণ সিউড়ী থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিকার্যে সেচ দেওয়া হয়। ফলে এক-এক জমিতে তিনবার করেও ধান চাষ হয়। তাছাড়া অন্যান্য ফসল তো আছেই। এই ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত ত্রিকুট পাহাড়ের সন্নিকট থেকে উৎপত্তি হয়ে বীর-ভূমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে রামনগরের পরে। পরে ভাগীরথীতে মিশেছে মৌগ্রামের কাছে। বীরভূমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র সাঁইথিয়া এই ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। এছাড়া বীরভূমের ভাণ্ডারী বন্য, কেন্দুলী, উলকুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামগুলোও ময়ূরাক্ষীর তীরে অবস্থিত। ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূমে প্রায় ৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে।

অজয় ঃ—বীরভূমের গুরুত্বপূর্ণ নদী অজয়। অজয় নদী বীরভূম এবং বর্ধমানকে বিভক্ত করেছে। হাজারীবাগের উত্তরপূর্বাংশে অবস্থিত চাকাই পর্বত থেকে উৎপত্তি। এর পর বীরভূম বর্ধমান

জেলাকে শীতল করে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে বিলীন হয়েছে। বীরভূমের বেশ কয়েকটি বড় বড় শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। ভীমগড়, দুবরাজপুর, বোলপুর। অবশ্য বোলপুর থেকে অজয় নদীর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল। এছাড়া জয়দেব—কেন্দুলী, ইলামবাজার এই নদীর তীরে অবস্থিত। বীরভূমের প্রায় আশি মাইল ব্যাপী এই নদী প্রবাহিত।

বক্রেশ্বর—বীরভূমের পবিত্রভূমি বক্রেশ্বর এই নদীর তীরে অবস্থিত। উৎপত্তিস্থল বিহারের সাঁওতাল পরগণা। অধিকাংশ সময়ই নদীটি শুষ্ক। জলের অভাবে নদীটি নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। কোপাই নদীতেই বক্রেশ্বরের আত্মসমর্পন।

হিংলা নদী—বীরভূমের গুরুত্বপূর্ণ নদী নয়। বীরভূমে মাত্র পনের মাইল প্রবাহিত। অজয় নদীর শাখা।

কোপাই—বোলপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে কোপাই নদী উত্তরমুখী হয়ে লাভপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। হিঙ্গলার উত্তর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে উত্তরাংশে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত।

ব্রহ্মণী—ছোটনাগপুর থেকে উৎপত্তি হয়ে নারায়ণপুরের কাছে বীরভূমে প্রবেশ করেছে। পরে সাঁকোর ঘাটের কাছে দ্বারকায় মিশেছে।

দ্বারকা—উৎপত্তিস্থল সাঁওতাল পরগণা। বীরভূমের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে আত্মসমর্পণ। বীরভূমের ডেউচায় দ্বারকার নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচকার্য হয়।

চন্দ্রভাগা—বীরভূমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। খুব উল্লেখ্য না হলেও রাঙা মাটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

কুশকর্ণিকা ও বাঁশলই—নদী দুটি বীরভূমের বিশেষ পরিচিত। বাঁশলই নদী বীরভূমের উত্তর সীমায় অবস্থিত। রেলের ব্রিজ আছে। ব্রহ্মণী নদীর খুবই সন্নিকটস্থ।

রাজনগর এবং ঘটঙ্গার পাশ দিয়ে কুশকর্ণিকা প্রবাহিত।

এছাড়া পাত্তানা কানারও জলে ধন্য বীরভূম। পাত্তানা সাঁওতাল পরগণা থেকে উৎপত্তি হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। কানা এবং মণিকর্ণিকার নাম খুব শোনা যায় না। শাখা নদী হিসেবে

বীরভূমের গৌরব বৃদ্ধি করে। অনেক নদী, শাখা নদী বীরভূমের উপর দিয়ে প্রবাহিত, তাই বীরভূম নদীমাতৃক।

অধিবাসী

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের ক্রমপরিবর্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছেঃ আদিম সমাজ, লোকসমাজ এবং নাগরিক সমাজ। প্রত্যেক আদিম সমাজই যে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা নহে, তাহা হইলে আদিম সমাজভুক্ত মানুষের আজ পৃথিবীতে অস্তিত্ব থাকিত না।"

সৃষ্টির পর ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে আদিম সমাজ-এর কিছু অংশ বর্তমান সমাজে এসেছে। আদিবাসী সমাজের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব থাকায় তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে কেউ কেউ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে, কেউ কেউ পুরাতন ধারা এখনও টিকিয়ে রেখেছে। বীরভূমের আদিবাসীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সাঁওতালরা ছাড়া অন্যান্য আদি-বাসীরা ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে অধুনা সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে। তবে অনেকের ধারণা বীরভূমের আদি অধিবাসী হল সাঁওতাল জাতি। ভবিষ্য পুরাণ অনুযায়ী "সাঁওতাল পরগণা এবং বীরভূম অঞ্চল এককভাবে নরিখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। ঘন বনে আচ্ছন্ন এলাকায় মধ্যাকৃতি এবং বাদামী রঙের একটা জাতি বাস করত। তারা ছিল দক্ষ তীরন্দাজ এবং কৃষিকার্যে নিপুণ।"

আদিম অধিবাসীদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি হত সংঘবদ্ধ জীবন। বীরভূমের সমতলভূমিতে আদিবাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে। কৃষিকার্যই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। কৃষির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করায় এই এলাকার আদিবাসীরা অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। কৃষি, প্রধানত ছিল বৃষ্টি-নির্ভর যদিও এখন বীরভূমের বেশ কিছু সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা-বৃষ্টি

নির্ভর। তাই প্রয়োজনে তারা চলে যায় সেচ সেবিত এলাকায় মজুর খাটার জন্য। অথবা বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

বীরভূম জেলা একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা। নানান সামাজিক উত্থান-পতন ঘটেছে এই অঞ্চলে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বীরভূম। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আয়ুধগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ে বীরভূমে জীবনযাত্রায় সুষ্ঠু সংস্কৃতির প্রবাহ ছিল। তবে বীরভূমের সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার মোল পাহাড়ী এলাকায় যে প্রত্নপ্রস্তর (palaeolith) ও নব্যপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন ধরনের অয়ুধ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে হস্তকুঠার (Handaxe), বাটালি (Chisel), ঘর্ষণী (Scraper), কুঠার ফলক (Celt) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাঁওতাল পরগণা থেকে উৎপত্তি হয়ে যে সমস্ত নদী বীরভূমের উপর দিয়ে প্রবাহিত, যেমন অজয় ময়ুরাক্ষী হিংলো দ্বারকা প্রভৃতি। এই নদীগুলোর তীর ভূমিতে প্রথমে জনসমাজ গড়ে উঠেছিল। আয়ুধই তার প্রমাণ। বীরভূমের সংস্কৃতির ধারা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রবাহিত "প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আয়ুধক্ষেত্র আবিস্কৃত" হওয়ার ফলে তা প্রমাণিত হয়েছে। বীরভূম জেলা লি মূলত কৃষিনির্ভর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "কৃষিভিত্তিক সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক হয়।" "কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজকে কেন্দ্র করিয়া কত সহজে একটি পরিবার এবং তাহা হইতেই একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে এক একটি গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়, যাযাবর প্রকৃতির পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে তাহা তত সহজে সম্ভব হয় না।"

নদীমাতৃক বীরভূমের মাটিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সমষ্টির মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে। সাঁওতালদের অবদান এতে সব চাইতে বেশী। সাঁওতালদের উৎসবের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চা অনেকখানি পূর্ণতালাভ করেছে। সাঁওতালদের উৎসব অনেকটায় বিজ্ঞানসম্মত। মানুষ যখন মানুষকে জানতে চাইল

তখনই আবিষ্কার হতে লাগল আমাদের উৎস কোথায়। স্বাভাবিক-ভাবেই আগ্রহ জন্মে এই জঙ্গল পরিবেষ্টিত বীরভূমের প্রথম মানুষ কারা, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বীরভূমের প্রথম বাসিন্দা হল পাহাড়িয়া উপজাতিরা। যারা মাল পাহাড়িয়া, সাউড়িয়া এবং কুমার ভাগ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বুচাননের বিবরণীতে আমরা পাই, সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালরা বাস করত। কার্স্টেয়ার্স-এর বিবরণীতে বীরভূমে সাঁওতালদের বসবাসের কথা জানতে পারা যায়। সাঁওতালরাই বিশাল বনভূমিকে কৃষিভূমিতে পরিণত করে। শাল মহুয়ার জঙ্গল ক্রমে কৃষি জমিতে পরিণত হয়। তবে তারা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করত। তাদের কোন স্থায়ী আস্তানা ছিল না। ১৮৩২--৩৩ খ্রীঃ "দামিন-ই-কো" অঞ্চল পরিবর্তন হওয়ার পরই সাঁওতালরা পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে লাগল। তাদের সংস্কৃতিতে হল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, মানুষের সামনে থেকে যখন অভাব সরে যায় তখন মানুষের মনে আনন্দ প্রাকাশের জন্য নানা উপকরণ সামনে আসে, আসে উৎসব। "এরো" উৎসব সাঁওতালদের বীজ বোনার উৎসব।

সাঁওতালরা জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে তেঁতো খায়। মাটির বাড়ীতে বেড়ীও দেয়, অগ্রহায়ণ মাসে জান্থা অর্থাৎ নবান্ন। হিন্দুরা যেমন নতুন ধানের চাল খাওয়ার আগে ঈশ্বরকে দিয়ে খায়। একটা দিন করে এক একটা গ্রাম নবান্ন উৎসব করে। সাঁওতালদেরও ঠিক সেই রকম জান্থা। এরপর আছে "বাহা" অর্থাৎ দোল। পৌষ মাসে বান্না প্রভৃতি।

বসন্ত কালে যখন গাছে নতুন পাতা গজায় তখন তারা উৎসবে মুখর হয়। নতুন পাতা ও ফুলে শুরু হয় বন্ধুত্ব। হিন্দুদের মধ্যেও ঠিক নবান্নেই উৎসব শুরু হয়। বাঙালীর যেমন বারো মাসে তেরো পার্বণ। সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও সারা বছর ধরে চলে উৎসব। যখনই তারা কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ল তখন তাদের মধ্যে অধ্যাত্মভাব ফুটে উঠল। ফলে প্রয়োজন অনুভব করল গাছ, পাখি, ফল, ফুলের। আত্মিক যোগসূত্র গড়ে উঠল সকলের সঙ্গে। স্বাবলম্বী হতে লাগল তারা। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছে অস্তিত্ব

রাখার জন্য সংগ্রাম। এদের সঙ্গেও শুরু হল জমিদারদের লড়াই। ফলে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। ১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে বীরভূম সাঁওতাল পরগণা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ল। সাঁওতাল সম্প্রদায় ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে লাগল।

সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সাঁওতালদের সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সাঁওতালদের মধ্যে শ্রমিকের ভাগ বেশী। অন্ন সংস্থানের জন্য সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা সাধারণ সম্প্রদায় মানুষের উপর বেশী করে নির্ভরশীল। বর্তমানে কৃষিকার্যের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আর হিন্দু বা মুসলিম সম্প্রদায় মানুষের থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ কাজে ফাঁকি কম দেয়। ফলে আকর্ষণটা তাদের প্রতি সকলের। দ্বিতীয়ত, সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় কৃষিকার্য ভাল না হওয়ায় তাদেরও অর্থের প্রয়োজন। ফলে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক।

সাঁওতাল সম্প্রদায় মানুষদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টান ধর্মে দিক্ষা নিয়েছে। বীরভূমের পশ্চিম এবং উত্তর প্রান্তের সাঁওতালরাই বেশী করে ধর্মান্তরিত হয়েছে। খৃষ্টান ধর্মে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন বাধা হয় নি এই কারণেই যে, তারা শূকর এবং গরু দুটোকেই খাদ্য বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে, যখন তাদেরকে প্রলোভন দেখায় তখন এই কথাটা খৃষ্টানরা বারে বারে বলে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর এবং শিক্ষার প্রসারেও তারা কিছুটা আগ্রহ দেখায়। এই সব কারণেই অনেক সাঁওতাল ধর্মান্তরিত হয়েছে। এতে আদি সাঁওতালদের থেকে খৃষ্টান সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অনেক উন্নত হয়েছে, এবং সাঁওতালদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হয়েছে।

সরকারের সংরক্ষণনীতির ফলে বর্তমানে সাঁওতাল সমাজ যথেষ্ট উপকৃত। সাঁওতাল গোষ্ঠীর অনেক বড় বড় অফিসার বিভিন্ন পদে রয়েছে। শিক্ষার আলোও যথেষ্ট পরিমাণে সাঁওতাল পল্লীতে প্রবেশ করেছে। সংরক্ষণনীতির সব চেয়ে বড় অবদান হল, এই সমস্ত অবহেলিত সমাজের মানুষ সুযোগ গ্রহণের জন্য দ্রুত অন্য স্থানে চলে যায় নি। অতীত ইতিহাসে যার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।

কোড়া : বীরভূমে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা কোড়া সম্প্রদায় বলে স্বীকৃত। এদের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন গবেষক মনে করেন কোড়া বা ওঁরাওরা মুণ্ডা উপজাতির অংশ বিশেষ। কোড়া সম্প্রদায়ের মানুষরা কৃষিকার্যে খুবই নিপুণ। প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে এরা মিশে গেছে এবং হিন্দুদের আচার, আচরণ সবই গ্রহণ করেছে। ফলে উপজাতি থেকে তপশীল জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর, সিউড়ী, বোলপুর প্রভৃতি থানায় কোড়া সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। বর্তমানে কোড়াদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন কোড়ারা যেহেতু মাটি কাটতে পটু, চলতি কথায় যাকে বলে "কোঁরা" যার অর্থ কাটা। "কোঁরা" থেকে এসেছে কোড়া।

মাল : অনেক গবেষকের ধারণা বীরভূমের আদি অধিবাসীদের মধ্যে মাল জাতির স্থানও আছে। মাল পাহাড়িয়া উপজাতি থেকেই মাল জাতির উদ্ভব। মাল শব্দটি গ্রিয়ারসনের মতে এসেছে দ্রাবিড় 'মালা' থেকে। যার অর্থ পর্বত। আবার বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণ করে ধারণা করা যায় মালদের সঙ্গে মানদের সম্পর্ক আছে। মানদের যখন বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে তখন জীবনধারণের উদ্দেশ্যে তারা ছড়িয়ে পড়ে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে।

মাল জাতি খুবই পরিশ্রমী। ফলে তারা শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকারের আদেশে সমভূমিতে বাস করতে বাধ্য হয়। সমভূমিতে বসবাসের ফলে তাদের জীবন-যাত্রাও উন্নত হয় এবং হিন্দু আচার সংস্কারগুলো গ্রহণ করে।

মালরা অনেকে ছত্রধারা বলে পরিচয় দেন। এক সময় রামানুজ লক্ষণের মাথায় নাকি ছাতা ধরে ছিল তাই ছত্রধারী বিশেষ বিশেষণে ভূষিত। সে যাই হোক মাল জাতি উপজাতির বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

মাল জাতির এক অংশ সাপ খেলাত, ফলে মালদের ঘরে মনসার মূর্তিও দেখা যায়। বীরভূমের মনসা সাধারণত এই সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষদের বাড়ীতেই দেখা যায়।

মালদের মধ্যে দ্রাবিড় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের লক্ষণ পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব মুক্ত হতে পারে নি।

বাউরী—

"গমনের শুভ বেলা
বাউরী যোগায় দোলা
তাতে বীর কৈল আরোহণ ॥

সে যুগে পালকি ছিল অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের যাতায়াতের একমাত্র হাতিয়ার সেই যুগে বাউরীরা ছিল বাহক। বাউরিরা ছিল দক্ষ পালকি বাহক। কিন্তু কালক্রমে বাউরী সম্প্রদায় পালকি বহনের কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষি মজুরের কাজ গ্রহণ করে। বাউরীদের সঙ্গে সাঁওতাল জাতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গায়ের রঙ এবং খাদ্যবস্তু বাউরী এবং সাঁওতালদের এক। তবে বাউরীরা হিন্দু সংস্কৃতিতে বেশী মাত্রায় প্রবেশ করায় গো মাংস তাদের ভোগ্য নয়! পৌরাণিক উপকথায় বর্ণিত আছে বাউরীদের পুরোহিত ছিল ব্রাহ্মণরা। এখন কিন্তু বাউরীদের পুরোহিত তারা নিজেরা হলেও বর্তমানে তারা ব্রাহ্মণদেরকেও পুরোহিত হিসাবে পূজা কার্যে ডাকছে। কারণ তারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী। কালী, দুর্গা, সরস্বতী, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতার পূজা করে। বাউরী জাতি দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। বীরভূমের বিভিন্ন শহরে বাউরী সম্প্রদায় মানুষদের বেশী মাত্রায় দেখা যায়। এবং শতকরা নব্বই ভাগই শ্রমিক। শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি। আর্থিক উন্নতিও তেমন হয়নি। পেশাদারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বাউরীদের পুজো করার আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মতি জানায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাঁকতলার মহা সম্মেলনে।

লোহার : লোহার সম্প্রদায়ের মানুষ মূলত সাঁওতাল পরগণার পার্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত লিপি প্রস্তর পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, লোহার সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা লোহার সরঞ্জাম তৈরীর কাজেই নিযুক্ত ছিল। এবং উপজাতি থেকে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্য সমাজে প্রবেশ করেছে। লোহার রাঢ়

এখন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান উন্নত সভ্যতায় তারা নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। উন্নত মানের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা শ্রমিকে পরিণত হয়। "দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা" এদের পুরোহিতের কাজ নেয়। এই ব্রাহ্মণদের অনুশাসনে ক্রমে হিন্দু ধর্মে পুরোপুরি ভাবে চলে আসে। লোহার সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুশাসন সকলেই মানে। দেখা যাচ্ছে সমাজের সব চাইতে সভ্য ব্রাহ্মণরাই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের ধর্মীয় অনুশাসনে সংঘবদ্ধ করেছে।

এছাড়া বীরভূমে বাগ্দী, লিট, বায়েন মুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আছে। "দেশব্যাপী আর্যীকরণের চাপে পাহাড়িয়া উপজাতিরা উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বাংলাদেশে মৌর্যযুগে আর্য উপনিবেশের ব্যাপকতার সুরু থেকে খুব জোরালোভাবে আর্যীকরণ সংঘটিত হয়েছিল, তখন থেকেই বর্তমান যুগ পর্যন্ত তথাকথিত আর্য ও প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের ধারা বয়ে চলেছে।" ফলে সমভূমিতে আগত উপজাতিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে এবং অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বর্তমানে যেমন মতবিরোধের ফলে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হচ্ছে, সে যুগেও আর্যীকরণের সময়ও মতবিরোধের ফলশ্রুতিতে বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি জাতির উদ্ভব। পেশার দিক দিয়েও তারা আলাদা হয়ে পড়ে। রাজনীতির ক্ষীণ ধারা সব সময়েই প্রবাহিত। তাই মতবিরোধ এখন দেখা যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে।

"একীকরণের" পিছনে রাজনীতি সর্বনাশের হাতিয়ার।

পটুয়াঃ দ্রাবিড় 'পড়ম' থেকে পট শব্দটি এসেছে। পট শব্দ থেকে পটুয়া শব্দের উৎপত্তি। পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের আদি বাস ছিল উড়িষ্যায়।

পটুয়ারা বীরভূমে সংখ্যায় খুবই কম। বীরভূমের চাঁদপাড়া, শিবগ্রাম, কালাচী, ষাটপলসা ইটাগড়িয়া প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পটুয়ারা। উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পটুয়ারা আসল বেদিয়া উপ-

জাতি। সাপ নিয়ে তারা খেলা করত। আবার চিত্রকরও বলে পটুয়াদের। পট দেখিয়ে এক সময় তারা জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু বর্তমানে পট থেকে তারা অনেকটায় সরে এসেছে। পটুয়াদের ধর্ম মূলত ইসলাম। ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মতোই নমাজ পড়ে, রমজান মাসে উপোস করে। পটুয়াদের একটা আলাদা ভাষাও আছে। যার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার হুবহু মিল আছে। পটুয়াদের বেশীর ভাগই এখন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। কেউ কেউ চিত্রকর।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে স্বর্গের অপ্সরী ঘৃতাচির গর্ভে বিশ্বকর্মার ঔরসে নয় পুত্রের জন্ম হয়। এই নয় পুত্র হল, চিত্রকর, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার, কংশকার, মালাকার ও তন্তুকার। এই নয় পুত্রের মধ্যে চিত্রকর পতিত হয়। তার কারণ চিত্রকর একদিন শিবের মূর্তি তৈরী করছে ঠিক সেই সময় ছদ্ম বেশে শিব পেরিয়ে যাচ্ছেন ব্রাহ্মণের বেশে। চিত্রকর বুঝতে পেরে তুলিটা মুখের মধ্যে পুরে দেয়। ব্রাহ্মণ রেগে ওঠেন এবং অভিশাপ দেন। তখন থেকেই পটুয়াদের বাস গ্রামের বাইরে।

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে বীরভূম হিন্দুদের গ্রামেই পটুয়ারা বসবাস করে। এই দেখে ধারণা হয় পটুয়াদের আদি হিন্দুরা। বসন সেনের পর পটুয়াদের অন্য ধর্মে প্রবেশ। মুসলমান শাসন কায়েম হলে হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান রাজাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে। মুসলমান রাজাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে থাকে। মুসলমান নবাবদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধার জন্য ইসলাম ধর্মের সুলতান। আবার হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে পট খেলা। তার একটা বড় কারণ হিন্দুদের গ্রামে বাস। হিন্দুদের অবহেলা। অন্যদিকে বাঁচার রসদ দাতা মুসলমান শাসকগণ। এই দুই নৌকায় পা দিয়ে বীরভূমের পটুয়ারা আজ সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তবে হিন্দু কালচারও তারা মানে। মুসলমানরা

বীরভূমের লৌকিক দেবী ঢেলাইচণ্ডী পূজা—১লা মাঘ : ছবি—লেখক

বীরভূমের আদিবাসীদের জনপ্রিয় বানা উৎসব

পটুয়াদের মেয়েদের বিয়ে করে। কিন্তু মুসলমান মেয়েদের বিয়ে দেয় না।

জৈন ঃ বীরভূমে জৈন ধর্মের মানুষ আছে। বিশেষ করে শহর এলাকায় জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষরা বসবাস করেন। জীবিকা ব্যবসা। আজ থেকে প্রায় ২ হাজার ৫ শত বছর পূর্বে ভগবান মহাবীর এই রাঢ় অঞ্চলে আসেন এবং বীরভূমের বহু জায়গা পরিদর্শন করে রাঢ় পরিদর্শনের সময় তিনি বীরভূমের সাঁইথিয়ায়ও আসেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "এক সময় বহু হিন্দু মহাবীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে নানা মতবিরোধ থাকার জন্যই কিছু কিছু হিন্দু অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।" কিন্তু পরে তারা পুনরায় হিন্দুধর্মে চলে আসেন। এখন যে সমস্ত জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ বীরভূমে বসবাস করেন তাঁদের কেহই বঙ্গভাষী নন। সকলেই রাজস্থানী, ব্যবসা প্রধান জীবিকা।

জৈন ধর্মের মানুষদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে একদল শ্বেতাম্বর অন্যদল দিগম্বর। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বর্তমান যুগকে মেনে নিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা বুঝেছেন যে, ঠিক অহিংসাটাকে ধরে বসে থাকলে চলবে না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আগে জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা কাপড়ের ব্যবসা করতেন। যদি তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেন তাহলে শিল্পে দেশ আরও উন্নত হোত। তবে বীরভূমের মানুষের দুর্ভাগ্য যে, মহাবীরের প্রচারিত ধর্মকে কেউ ধরে রাখতে পারেনি। বীরভূমকে যাঁরা ধরে রেখেছেন তাঁরা বাইরের। 'আচারাঙ্গসূত্ত' নামক একখানি জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, "মহাবীর কেবল জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-ব্যপদেশে তিনি রাঢ় দেশে আসিয়া উপনীত হন। তখন এই রাঢ় দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসভ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল ও অন্যান্য নানাভাবে অপমান করিয়াছিল।"

"মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং

সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ জৈন সাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা বা কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার কোনটির সঙ্গেই এই অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।"

["বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রারম্ভ"—প্রবোধচন্দ্র বাগচী] বীরভূমের জৈনরা ধার্মিক। ধর্মের প্রতি আছে প্রচণ্ড অনুরাগ। মহাবীর কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চ মহাব্রত মেনে চলেন। এই পঞ্চ মহাব্রত হল— ১। অহিংসা, ২। সত্য, ৩। ব্রহ্মচর্য, ৪। অচৌর্য, ৫। অপরিগ্রহ।

মহাবীরের বক্তব্যের প্রধান বিষয়—সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন এবং সম্যক চরিত্র। কিন্তু মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্মের সব কিছুকেই হুবহু অনুসরণ করলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব। বাস্তবকে অস্বীকার না করে কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রমে ব্যবসার উন্নতিতে পাপ হয় না; শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় একথা মনে করেন। আড়াই হাজার বছর আগের দিনগুলোকে যদি এখন ধরে রাখা হয় তো অ-পরিগ্রহ হয়েই থাকতে হবে। তাই তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলেছেন।

বীরভূমের সাঁইথিয়াতেই জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ বেশী বাস করেন। তাঁরা সকলেই বাইরের। কোন হিন্দু বাঙালী জৈন-ধর্মাবলম্বী নেই। এখানকার জৈনরা হলেন বেশ প্রভাবশালী এবং বিত্তবান। এখানকার জৈন মন্দিরগুলো অনেকটা হিন্দু মন্দিরের মতো। হিন্দু ধর্মের প্রতিও এঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

একজন জৈন ধর্মাবলম্বীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন— "আমাদের পূর্ব পুরুষরা তো হিন্দুই ছিলেন, সুতরাং আমাদের দেহে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত শুধু মনটা আলাদা।"

জৈনরা মারোয়াড়ী বলে পরিচিত। এই মারোয়াড়ী ছেলেমেয়েরা সারি বেঁধে হিন্দু মন্দিরে আসেন। তবে তাঁদের ব্যবসায়িক দক্ষতা প্রচণ্ড। নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসা করেন। তাই তাঁদের থেকে ব্যবসায় অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা অনেক পিছিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে মারোয়াড়ীদের দান সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। তাঁদের উদ্যোগে কতকগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও চলছে।

সংস্কৃতিতে

বাউল

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে বীরভূমই বাউলের জন্য প্রসিদ্ধ। বীরভূমের সংস্কৃতি মূলত ভূমিজ। এখানকার মানুষ বেশীর ভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে কলকারখানার অশুদ্ধ ধোঁয়া নেই। আছে ঢল নামা রাঙা মাটির আবরণ। সুস্থ পরিবেশে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র। এখানে ভিক্ষার ঝুলি হাতে বাউল চলে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বাউল সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, "সে হল যোগী সিদ্ধদের গানে ছড়ায় আঁকা যোগী ভিখারিরই কালোচিত রূপ বদল। তার কানে শঙ্খ কুণ্ডল, এবং হাতে লাউয়া আর হাতে দ্বাদশ (বা খণ্ডা) কাঁধে ঝুলি, ছেঁড়া কাঁথা উত্তরীয়, গায়ে ছাই মাখা, মাথায় 'ঝুলনি', দেহ ক্ষীণ, মুখে নিরঞ্জনের তর্জা। পাগলের মতো আচরণ। সঙ্গে দশজন শিষ্য।"

বীরভূমের বাউলরা এখন অনেকটা আধুনিক। সমাজ যখন পরিবর্তনশীল তখন বাউলদেরও পরিবর্তন হবে এটা স্বাভাবিক। বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় বাউলরা গান গায়। বাউল দর্শন। বাউল শব্দটি এসেছে 'বাতুল' শব্দ থেকে। যার অর্থ 'বর্জন'।

ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বাউল সাধকেরা গোপনীয় গূঢ়সঙ্কেতবাহী ব্রতকৃত্যের সাহায্যে সীমাবদ্ধ সত্তার মধ্যে সেই সীমাহীন মনের মানুষকে ধরতে চেয়েছিলেন। বাইরের লোকের সে রহস্যময় সাধন প্রণালী জানার অধিকার নেই। কিন্তু তাঁদের গানের ভাবে ও ভাষায় সেই অপার্থিব তত্ত্ব কিছুটা ধরা পড়েছে যা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ বাউল তন্ত্রের গোপনীয়তা প্রয়াসী আচার-আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হন নি। তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল বাউল গানের অসাধারণ কবিত্ব এবং গভীর উপলব্ধি, যার সঙ্গে তাঁর মনের মিতালী ঘটেছিল।"

ঠিকই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বীরভূমের বাউলদের ঠিকমত ভাবে কাছে টানতে পারেন নি। কারণ তিনি 'ব্রাহ্ম' ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। বীরভূমের বাউলদের গানের মাঝে স্বচ্ছ বৈষ্ণবীয় ভাবধারা পরিস্ফুট। যার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সামনে এই মূর্তি কল্পনাটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়—

এই বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট বোঝা যায়—

"গুরুদেবের বয়স যখন ৩২-৩৩ বছর, তখন শিলাইদহের পাশে পদ্মার তীরে লালন ফকির এবং তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে গুরুদেবের ঘনিষ্ঠতা হয়। রাঢ় অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় ছিলই। রাঢ় অঞ্চলের বাউলরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ধর্ম অনুসারী বাউল। শিলাইদহে গিয়ে তিনি গভীর ভাবে বাউলদের সঙ্গে মিশলেন এবং তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। এখানে তাঁদের যে দার্শনিক তত্ত্ব পেলেন তা অভিনব। গুরুদেব বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করলেন যে, এখানকার (শিলাইদহের) বাউলরা বৈষ্ণব বাউলদের মতো রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করেন না। তিনি দেখলেন বাউল ফকির সম্প্রদায় বলতে চেয়েছেন যে, তাঁরা 'তাঁকে' অন্তর থেকে বুঝতে চান। 'তিনি' প্রতি মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন। এই রকম এক প্রাণপুরুষকে বাউলরা বলে গেছেন মনের মানুষ, অধরা কিংবা অচিন পাখী।

'এঁকে' ওঁরা সব সময় বুঝতে চেয়েছেন গভীর এক প্রেমের সাধনার দ্বারা।"

* * *

"গুরুদেব শিশুকাল থেকেই তাঁর পিতৃদেবের কাছে পেয়েছিলেন জ্ঞান মার্গের তত্ত্ব এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যৌবনে গৌড়ীয় সাহিত্য ধর্ম দর্শনের প্রতি। সেখান থেকে তিনি ভক্তি মার্গ এবং প্রেম সাধনা বুঝতে চেষ্টা করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হন। তিনি চৈতন্যদেবের সাধনা গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে তাঁর গভীর মনঃসংযোগ ঘটলেও একটা অসুবিধা হয়েছিল সেটা হচ্ছে নিরাসক্ত প্রেম সাধনা। রাধাকৃষ্ণের নিরাসক্ত প্রেম সাধনায় তাঁর একটা খটকা ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ নিরাকার প্রেমের উপাসক, বৈষ্ণবদের কাছ থেকে বা বাউলদের কাছ থেকে তিনি যে প্রেম মার্গের পরিচয় পেলেন তাকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ সেখানে একটা মূর্তির কল্পনা আছে।

ব্রহ্মবাদ এবং বৈষ্ণবীয় প্রেম সাধনা। বীরভূমের বাউলদের প্রতি তাই রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হতে পারেন নি। কিন্তু লালনের কাছ থেকে তিনি তাঁর মনের মানুষকে পেয়েছিলেন।

বাউলের বিরহ-বেদনাকে বিশ্ব সমাজে গানের সুরে প্রচার করেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক বীরভূমের পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়। বর্তমানে বাউল চর্চায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। নিরাসক্ত প্রেমসাধনার পরিবর্তে পেশাদারী সঙ্গীতের প্রতি গায়কদের আকর্ষণ প্রবল। গণমাধ্যমের মাধ্যমে মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি প্রবেশের জন্য বাউলরা লঘু সুরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

আঞ্চলিক লোক সংগীত

লোক সংগীত মূলত পেশাদারী গান। গ্রাম বাংলার কতকগুলো অপ্রচলিত শব্দই এই সংগীতের প্রাণ কেন্দ্র। এখানে বৈষ্ণবীয় ভাব-ধারার প্রবেশ ঘটেনি। আমরা জানি, সাধারণত লোকসংগীতের কোন রচয়িতা থাকে না। লোকের মুখে মুখে সৃষ্টি হয় সংগীত। একজন বিদগ্ধ সমালোচকের মতে "এ······· একজনের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার পর তা হয় সার্বজনীন। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবই যার উপাদান।" Traditional কোন কোন লোকসংগীতের তাল থাকে। কোন সংগীতের থাকে না, যাকে বলে ভাটিয়ালী। বর্তমানে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শোনা যায় বিভিন্ন ধরনের লোক সংগীত। প্রচলিত বলেই প্রচারিত হয়। কিন্তু কখনও কখনও নামও শোনা যায়; লোকসংগীত যে রচনা হবে না এ কথা বলা ঠিক নয়। লোক-সংগীত বলতে লোকের সংগীত বোঝায়। আদিম সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। মানুষের মধ্যে সাহিত্য সংগীত স্পৃহা জাগ্রত হয়। সেই সংগীত ক্রমপরি-

বর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান লোকসংগীতে পরিণত হয়েছে। বীরভূমের আশানন্দন চট্টরাজ আকাশবাণী স্বীকৃত একজন লোক-সংগীত রচয়িতা। আদিম যুগে যখন সাহিত্য এবং সংগীত সৃষ্টি হয়েছে তখন তার রচয়িতা ছিল। তাই বর্তমান যুগেও থাকা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে গীতিকার অনিল চক্রবর্তী বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। বীরভূমে লোকসংগীতের চর্চা খুবই বেশী। বীরভূমের সংস্কৃতিতে লোকসংগীতের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে এই সংগীতের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথাবার্তা সংস্কৃতিকে বিকৃত করছে। জনপ্রিয় হওয়ার জন্য কিছু পেশাদারী শিল্পী যেভাবে সংগীত পরিবেশন করছেন তাই এই সংগীতের ভবিষ্যৎ হয়ত অন্ধ-কার হয়ে যাবে। বীরভূম এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে, বাস্তব সত্যকে উলঙ্গ করে দেখানো হচ্ছে, ভবিষ্যৎ চিন্তার বা সমাজ গঠনের কোন মূলসূত্র তাতে নেই। তাই লোকসংগীত বিশেষ করে বীরভূমের আঞ্চলিক লোকসংগীত সার্বজনীন হতে পারছে না। বাংলার সংস্কৃতিতে এক একটা অঞ্চল বিশেষ প্রভাব ফেলে। সেক্ষেত্রে বীরভূম বেশ পিছিয়ে। তবে বীরভূমের গায়কদের যথেষ্ট প্রতিভা আছে। অনেকে বেশ প্রতিষ্ঠিত।

আলকাপ

বীরভূমের লোকসংস্কৃতিতে আলকাপের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। বিশেষ করে তপশীল জাতি এবং গরীব মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের আলকাপ খুবই প্রিয়। আলকাপের গান বা নাটকের প্লট ঐ শ্রেণীর মানুষদের মত করেই রচিত। আলকাপের নাট্যরীতিতে একটা হাস্যোচ্ছ্বল পরিবেশ তৈরী হয় এবং পাশাপাশি বসবাসকারী দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও ঐক্য গড়ে ওঠে। কারণ গানের মধ্যে এবং নাটকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য পরিস্ফুট। আলকাপের নান্য রীতিতে অশ্লীলতারও প্রভাব আছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের কাছে যা অবশ্য খুবই প্রিয়।

আলকাপ প্রথম সৃষ্টি হয় উত্তরবঙ্গে। মালদহের মোনাকথা

গ্রামের দুই সতীন-এর মধ্যে ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই আলকাপের সৃষ্টি। দুই বউ-এর ঝগড়ায় বোনা কানার জীবন ওষ্ঠাগত হয়। তাঁর সেই বেকার জীবনের কাহিনী পালার মাধ্যমে জনসমাজে তুলে ধরেন। তাঁর সেই জীবন কাহিনী মালদহ মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আলকাপ রঙ্গরসের নাটকে পরিণত হয়। 'সঙাল' অর্থাৎ যিনি কমিডিয়ান, তাঁর সংলাপে অশ্লীল হাস্যরস ফুটে ওঠে। মানুষের মধ্যে আসে আনন্দের জোয়ার। সেই জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে বীরভূমের গ্রামে-গঞ্জে। তখন-কার আলকাপ এখনকার আলকাপের মতো নয়। রাতের অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বা বেলতলায় লণ্ঠন জেলে তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে গান হোত। বীরভূমে যা 'ছ্যাঁচড়া' বলে পরিচিত। যার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের প্রবেশ ঘটত না। যদিও 'আলকাপ' এখন সমাজে টিকিট কেটেও পরিবেশিত হচ্ছে।

'ছ্যাঁচড়া' বা 'আলকাপ' সারা রাত ধরে হয়। গান শুরুর আগেই দেখানো হয় একটা 'ট্রেলার'। মূকাভিনয়। কোন পৌরাণিক কাহিনী থেকে বা কোন সামাজিক ঘটনাকে নিয়ে তৈরী হয় ট্রেলার। তারপর শুরু হয় গান। হাস্যরস। কোন বিষয় ভিত্তিক 'পালা'। সারা রাত ধরে চলে রঙ্গ-রস। হাসির গান বসে। রাতের ঘুম কেড়ে নেয় কৌতুক অভিনেতা। আলকাপ বা ছ্যাঁচড়া একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলে না। কারণ বুদ্ধিজীবীদের অভাব। যাঁরা থাকেন সব গ্রামীণ। বীরভূমের সংস্কৃতিতে আলকাপ খুব বেশী দিন না এলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে খুবই তাড়াতাড়ি। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে এই আলকাপের উল্লেখ আছে।

আলকাপ এসেছে "আল ও কাপ দুটির দ্বিত্ব প্রয়োগে।" সৈয়দ খালেদ নৌমামের "মুর্শিদাবাদ লোকসংস্কৃতিঃ আলকাপ" প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়.... " উত্তরবঙ্গে 'রঙতামাশা' বোঝাতে কাপ শব্দের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদে ও মালদহের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে রংগ নাটিকা অর্থে 'কাপ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভারতচন্দ্রও রংগরসকারী অর্থে 'কাপ' (কপট = কাপ) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আবার 'আল' শব্দও রংগ-তামাসা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চলিত কথায় বলে 'আল-কুটমো'। অর্থাৎ তামাসা। আদি রসে ভরপুর এবং একটা স্বচ্ছ গতিতে পরিবেশিত হয় না আলকাপ। এর মধ্যে কখন 'হিন্দুশাস্ত্র' বা 'হাদিশ', কখন স্বামী-স্ত্রীর অশ্লীল বা মধুর আলাপ। হঠাৎ হঠাৎ কৌতুক অভিনেতার আবির্ভাব, সব মিলিয়ে খিচুরী বা ছ্যাঁচড়া। যা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের খুবই প্রিয়।

বীরভূমে এখন আলকাপ খুবই জনপ্রিয়। আগে পুরুষরাই মহিলা সেজে অভিনয় করত। এখন ভাড়াটিয়া মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করানো হচ্ছে। তবে রসের মাত্রা কমেনি বই বেড়েছে। যা অবশ্য দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে পাশাপাশি বসিয়ে সমান তালে আনন্দ দেয়। ফলে আলকাপের বড় শক্তি ঐক্যশক্তি। বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষেরা সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে আলকাপ, এর প্রধান কারণ রসের আধিক্য, জটিলতার অভাব। খুব সহজেই অন্তরে প্রবেশ করে। সারাদিনের কর্মক্লান্তের পর রসাস্বাদন তাঁদের খুবই ভাল লাগে। বীরভূমে সম্প্রীতির গান এখন 'আলকাপ' গান ও পালা।

ভাদু গান: বীরভূমের ভাদু গান মূলত শরতের। ভাদ্র মাসে শোনা যায় ভাদু গান। একটা পুতুলকে কোলে নিয়ে এক-জন নাচিয়ে কতকগুলো লোকের সামনে গানের তালে তালে নাচে। বীরভূমে ভাদু গানের জনপ্রিয়তা আছে। ঢোলের তালে তালে নাচে। কোন বিদেশী প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। ভাদ্র মাসে এই গান পরিবেশিত হয় বলেই এই গানের নাম ভাদু গান। উৎসব-মুখর বাঙালীর উৎসব লেগেই আছে। প্রত্যেক ঋতুতেই নানা উৎসব। প্রায় ১৮২ বছর পূর্বে এই ভাদু গানের উদ্ভব হয়েছিল। কোন উৎসব সৃষ্টির মূলে কোন একটা উপলক্ষের দরকার। এই ভাদু গানের পিছনেও তাই আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় "বর্ষা উৎসব" বলেছেন। ডঃ সুধীর করণের ভাষায় "সংস্কৃতির একটা নজীর" হলেও ভাদুর অস্তিত্ব ছিল।

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যার মতে "রাজকন্যা হলে কি হয়, তাঁর টান গরীব দুঃখী প্রজাদের উপর; বাগদী, সরাক, বাউরী, খেড়ে ও ভূমিজদের উপর। ওদের দুঃখ সে দেখতে পারে না, ওদের

ঘরে ঘরে যায়। বাবা বোঝান, মা বোঝান, সান্ত্রী মন্ত্রীরা বোঝান ঃ ওরা নিচু জাত, ওদের সঙ্গে মিশতে নেই। ওদের প্রতি ভাদুর মমতা ততই যায় বেড়ে। ওদের ওপর অন্যায় ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করে। ঘা লাগে রাজার আভিজাত্যে। প্রচণ্ড বাধা দেয় রাজশক্তি। ব্যর্থকাম ভাদু করে আত্মহত্যা। ছুটে আসে রাজ্যের বাউরি-বাগ্‌দির দল। ওরা কাঁদতে কাঁদতে ভাদুর মৃত দেহ নিয়ে যায় কাঁধে করে নদীর ঘাটে। দাহের পর গ্রামে গ্রামে বসে যায় শোক করতে। ওরা ভাদুর মূর্তি গড়ে।"

ভাদু গানের সূত্রপাত এই ভাবেই। নীলমণি সিং-এর মেয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা রাঢ় অঞ্চলে।

অনেকের ধারণা ভাদুর আত্মহত্যার পর তাঁর পিতা নীলমণি সিংহই ভাদুর গানের সূত্রপাত করেন। পিতার চোখের জলেই ভাদু গানের উৎপত্তি। কাশীপুরের রাজার আদেশ প্রজারা সানন্দে গ্রহণ করে।

ডঃ কামিল্যার মতে "ভাদুর আত্মহত্যার একটা অন্যতম কারণ নিচুজাতির তরুণের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত।"

ভাদু সমাজের অবহেলিত জাতির দুঃখে ভেঙে পড়ত। অর্থাৎ দুর্বল মানুষের জন্যই তাঁর আত্মত্যাগ, ভাদু গান যাঁরা করেন তাঁরা শতকরা ৯০ ভাগই 'নিচু' জাতির মানুষ। 'নিচু' বলতে অবহেলিত জাতিকেই বোঝাচ্ছি। ভাদু গানকে যদি 'কুমারী গান' বলা যায় তো বাধা কোথায়? কারণ ভাদু শস্য বা বর্ষা উৎসব নয়। বীরভূমের প্রায় সর্বত্রই এই গানের চলন আছে। বীরভূমে যে সমস্ত গান প্রচলিত আছে তার কয়েকটি দেওয়া হল ঃ

[গানগুলো কিশোরী রঞ্জন দাস মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে নেওয়া]

ভাদুকে প্রণাম করি, পরম সুন্দরী
জয় জয় বন্দনা গাই আমি তাই।
তুমি ভাদু পরের বধূ ভাদ্র মাসে এলে
নেই যে কিছু,
আছে ভক্তি করিব পূজা—মনে মনে করিত তাই।

পরণে তোমার ঢাকাই শাড়ী
রূপের বাহার আহা মরি!
বেণী ঝোলে, কুণ্ডল দোলে, নূপুর বাজে
রাঙা পায়।

ভাদু গানের মধ্যে 'অবৈধ' প্রেমের একটা সামাজিক বাধার দম্ভ ফুটে ওঠে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে বাঙালী হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যে জাতিগত বাধা, যাতে অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে আত্মাহুতি দিতে হয় যা সমাজের বুকে কলঙ্ক। ভাদু এই বাধার বুকে এক আঘাত। কুমারী ভাদুর অব্যক্ত বেদনা ফুটে ওঠে গ্রাম বাংলার নারীর কণ্ঠে—

ওগো, হলো না হলো না, ভাদুর বিয়ে হলো না,
ভাদুর বিয়ে দিব দেখে যার গাড়ি বাড়ি আছে,
ঘরে কুঁয়ো ঘরে টিউবওয়েল বাইরে যেতে দিব না।
নব সম্বন্ধ আশীর্বাদী করলাম কত ছোটাছুটি
বিয়ের রেতে খবর এলো ভাদুর বিয়ে হবে না
ভাদু আমার রাজনন্দিনী কৃষ্ণপ্রেমের কাঙালিনী
বন্ধুর লাগি রইলো বসে ভাবের বন্ধু এলো না।
ভাদু আমার রাজকুমারী যাবে না শ্বশুরবাড়ী
প্রাণের মানুষ গেল মরে এ জীবন আর
রাখবো না॥

ভাদুর অকাল মৃত্যুই তাঁকে পূজার আসনে বসিয়েছে। সারা ভাদ্র মাস ধরে চলে ব্রত। সামাজিক পটভূমিকায় রচিত নানা গানে ভাদুকে পেঁছে দেওয়া হয় প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে—

"যাবে না যাবে না ভাদু যাবে না শ্বশুরবাড়ী
আমার ভাদু জ্যেষ্ঠ ছেলে—রাজকুমারী।
ভাদু আমার মটর নেবে নামটি তাহার জীপগাড়ি,
একা যদি না যায় ভাদু সঙ্গে দিব মোহরী।
ভাদু আমার কলেজ যাবে হাতে গো তার চেন ঘড়ি।
হেলে দুলে যায় গো ভাদু কাপড়ে দেয় ফড়ফড়ি!"

ধান পোতা হয়ে যাওয়ার পর ভাদ্র মাসে মানুষের কাজ কম থাকে। ফলে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়ানোর কোন অসুবিধা থাকে না। গ্রামে গ্রামে শুরু হয় ভাদু গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই গান "প্রধানত বিলাবল ধাটের অনুসরণে সাদামাটা সুরেও দুই বা তিন মাত্রার ছন্দে গাওয়া হয়।"

[সুনীল সাহা—"বাংলার মাটি ও তার কিছু গান"]

ভাদু সমাজের নিচু তলার মানুষের সঙ্গে উপর তলার মানুষের সেতু। (ভাদু যে সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তা অবশ্যই বিভেদহীন বৈষম্যহীন। পণ প্রথা সমাজের বুকে একটা বড় ব্যাধি। ভাদুর মনে এ নিয়েও একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। সেই কথা মনে করেই পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয় রচনা করেন নিচের গানটি—

ভাদু করি গানের কল্পনা,
বেকার ছেলে বেড়ায় ঘুরে চাকরী মেলে না।
প্রধানমন্ত্রী করে আলোচনা
বন্ধ করিল যত দেশের কারখানা।
রাজার মত হলে রাজা কলঙ্ক তার থাকে না।
বেকার ছেলে বেড়ায় ঘুরে চাকরী মেলে না।

*   *   *   *

বীরভূমের সংস্কৃতিতে ভাদু গানের একটা বিশেষ স্থান আছে। সমাজের মধ্যে যে জাতিগত বৈষম্য তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের যে আকুতি, ভাদু তাদের প্রেরণা স্থল।

"ভাদুর আগমনে,.
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে!"

বীরভূমের পূর্ণচন্দ্র দাস, রতন কাহার প্রভৃতি ভাদু গান রচয়িতারা বীরভূমে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। ভাদু গান বা ব্রত এখন বীরভূমের অধিকাংশ মানুষের প্রিয়। বীরভূমের বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ও এই সংগীত প্রচারে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি কাজ করছেন।

কবি গান

বীরভূমের সংস্কৃতিতে কবি গানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কবি বলতে আমরা কবিতা রচয়িতাদেরই বুঝি। কিন্তু যাঁরা কবিয়াল, অর্থাৎ কবি গান পরিবেশন করেন তাঁরাও এক ধরনের কবি। যেমন চারণ কবি মুকুন্দদাস যে পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে গান রচনা করতেন, ঠিক সেই রকম কবিয়ালরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে গান রচনা করতে পারেন। কবিদের মতো কবিয়ালরাও প্রতিভাধর।

বহু পূর্বকাল থেকেই কবির লড়াই হয়ে আসছে। চাঁদ মহম্মদ—জোমানী বা কিশোরীর কবির সঙ্গে বীরভূমের মানুষ পরিচিত। বা মাড়কোলার গৌর সাহাও আসর জমিয়ে রাখত।

কবির লড়াই-এ দুজন কবিয়াল দুই রূপ ধরে প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে লড়াই জমে ওঠে।

বর্তমানে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে কবিয়ালদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা বা সাক্ষরতার কর্মসূচীতে কবিয়ালদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে কবি গান একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। যখন কবি গান হয় তখন দেখা যায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসে কবি শুনছে।

বীরভূমে আসর অনুপাতে কবিয়ালদের পালা দেওয়া হয়। কোথাও পৌরাণিক পালা আবার কোথাও এ কাল-সেকাল যে-কাল। কবিয়ালদের উপস্থিত বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। উপস্থিত বুদ্ধির জন্য কবিয়ালরা পালাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। গান্ধারী—কর্ণ পালা বা লক্ষ্মণ—মেঘনাদ সব ধরনের পালা বীরভূমে চলে।

কবিগানের প্রভাব এখন বীরভূমের সমস্ত গ্রামেই আছে। কবির গানের মধ্যে দুই কবিয়ালের ঝগড়াই মানুষকে স্থির চিত্তে বসিয়ে রাখে। তবে ঝগড়ার মধ্যে কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করলে পরিবেশ দূষিত হয়, অনেক সময় দেখা যায় কবিয়ালরা প্রসঙ্গ

ছাড়িয়ে রসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরজন্য কবিয়ালদের সংযমী হওয়া দরকার। গানের মধ্যে রসের প্রয়োজন তবে তা কখনই অশ্লীল নয়।

বীরভূম তথা রাঢ়ীয় সংস্কৃতিতে কবি গান একটা বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে। এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রার যুগ থেকে আজও কবি গান সমান তালে বয়ে চলেছে।

তবে, বীরভূমের জমিদারের উৎসাহে, অর্থে কবির লড়াই খুবই জমত। এখন জমিদারদের আর্থিক অবনতি এবং মানসিক দুরবস্থার জন্য কবির লড়াই জমিদার পরিবারের উৎসাহে কদাচিত হয়। বীরভূমের সুসন্তান লাভপুরের জমিদার বংশের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে কবি গানের দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

সমাজ ব্যবস্থায় দিন দিন দেখা যাচ্ছে হিংসার আগুন জ্বলে উঠছে। সহযোগিতার অভাব। মানুষের মনটাকে কাব্যময় করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। মানুষকে সহনশীল, পরপোকারী হতে হলে ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজন বিশেষ করে যখন সাম্প্রদায়ি-কতার আগুন জ্বলছে, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করে সম্প্রীতি রক্ষার্থে কবি, আলকাপের প্রয়োজন। বীরভূমে কবি গানের সম্প্রদায় যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সরকারী অনুদানে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা বিভিন্ন জায়গায় গান পরিবেশন করেন। তর্কে অংশ নেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়েই পালা শেষ হয়ে যায়। মানুষের তৃপ্তি হয় না। আবার আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু সর্বত্র ইচ্ছা থাকলেও কবির লড়াই জমে ওঠে না। দুই পক্ষের ঢুলির 'বোল' এবং প্রশ্নোত্তরের আসর জন-জীবনে সঞ্চারিত করে আনন্দের জোয়ার। উপস্থিত বুদ্ধি এবং রীতিমত পড়াশোনা না থাকলে ভাল কবিয়াল হওয়া সম্ভব নয়। দুই কবিয়ালের মধ্যে আসরে চরম ঝগড়া শুরু হয়। মনে হয় হয়ত আর মিলন হবে না। কিন্তু পালা শেষ হলেই দেখা যায় কোথায় ঝগড়া! পেশাদারী কবিয়ালেরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সব সময় অভিনয়ই করে। কিন্তু সে অভিনয় এত বাস্তব হয়ে ওঠে যে,

মনে হয় ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ, বা অপর কোন চরিত্র। কবি প্রকৃত গান, সুস্থ সংস্কৃতির বাহক।

লৌকিক দেবদেবী

ধর্মরাজ

রাঢ় অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অনার্যরা বাস করত। পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চল থেকে মূলত আর্যরা রাঢ়ভূমিতে আসে। আদি অস্ট্রালেরা এই রাঢ়ভূমিতে বসবাস করত। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের প্রতি এদের ছিল যথেষ্ট অনুরাগ। এরা ধর্মরাজ পূজা করত। ধর্মরাজ পূজা প্রাক্-দ্রাবিড় যুগের। নির্দিষ্ট কোন সময় না পাওয়া গেলেও বিপুল আড়ম্বরে এই পূজা হোত, এখনও হয়।

রাঢ় অঞ্চল বৌদ্ধদের বেশ শক্ত জায়গা ছিল। বৌদ্ধদেরও নাকি ঠাকুর ধর্মরাজ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে "ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ।" বৌদ্ধরা মনে করেন বুদ্ধদেবের আর এক নাম ধর্ম। কিন্তু বুদ্ধদেব অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মরাজ পূজা যদি বুদ্ধদেবের সৃষ্টি হোত তো ধর্মরাজ পূজায় নরবলি হোত না। তবে ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মতে "হিন্দুদের বৌদ্ধধর্মে টানার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু লৌকিক দেব-দেবীও তাদের কুক্ষিগত হয়। "ধর্মরাজও হিন্দুদের হাত থেকে ধর্মান্তরিত বৌদ্ধদের হাতে চলে যায়। সাধারণত, বুদ্ধ পূর্ণিমাতেই এই ঠাকুরের পূজা হয়। যদিও রাঢ়ে ধর্মরাজ পূজা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় হয়।"

ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবার বলেছেন 'ধর্মের' সঙ্গে কূর্মের মিল আছে। কূর্ম বিষ্ণুর অন্যতম অবতার, হিন্দুদের দেবতা বিষ্ণু। ধর্মরাজ হিন্দুদের কাছে বিষ্ণুরই একটা রূপ মাত্র। কূর্ম হিন্দু শাস্ত্রে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

বৌদ্ধরা যখন ধর্মরাজকে স্বয়ং বুদ্ধদেব বলে ব্যাপক প্রচার শুরু করে, তখন গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বর্ত-

মানে রাজনৈতিক দল গঠনের মতো ধর্মীয় প্রচার শুরু হয় তুঙ্গে। কিন্তু কালে হিন্দুদেরই জয় হয়। বৌদ্ধ প্রভাবিত রাঢ় অঞ্চলে ধর্মরাজ পূজা প্রাক্-দ্রাবিড় যুগের মতোই শুরু হয়। তবে নরবলির পরিবর্তে হয় ছাগ বলি।

ধর্মরাজ আবার যমরাজার নাম। কিন্তু যে সমস্ত শিলা ধর্মরাজ বলে পূজিত হয় তা মূলত বিষ্ণুরই আকৃতি বহন করে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের যে ভাবে যে রূপে ঈশ্বর পূজায় নিবিষ্ট করেছে সেখানে ধর্মরাজ অবশ্যই বিষ্ণু। কূর্মের রূপ যদিও সব জায়গায় দেখা যায় না তবে কূর্মকে অস্বীকার করাও যায় না।

ধর্মঠাকুরের ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নরূপ—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো ন নাদঃ।
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য ॥
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্বলোকৈকনাথম্।
ভক্তানাম্ কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিম ॥

এই ধ্যানমন্ত্রটির জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংগ্রাম শুরু হয়। হিন্দুরা দেবতার আকারে বিশ্বাসী। কিন্তু বৌদ্ধদের বুদ্ধদেব। ধ্যানমন্ত্রটিতে কোন মূর্তির কল্পনা নেই।

ধ্যানমন্ত্রটি যিনি তৈরী করেছিলেন তিনি ছিলেন মূলত বৌদ্ধ। তবে একটা দেখার বিষয় আছে হিন্দুসমাজের দুর্বলতর মানুষদেরই বেশী করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের অবহেলার জন্যই নিচুতলার মানুষরা আশ্রয় খুঁজেছে। তাই ধ্যানমন্ত্রটি কোন উচ্চ শ্রেণীর মানুষের তৈরী এবং খুব সহজ ভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে। ডোমরা হিন্দুদের প্রভাব মুক্ত শেষ অবধি হতে না পারায় দুই সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই এগিয়ে আসে। সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মরাজ আজ দেবাংশীদের ঠাকুর। ডোমদের মধ্যে ধর্মরাজ ঠাকুর সেবা খুবই কম দেখা যায়।

রিজ্‌লী যদিও বলেছেন "ডোমরাই ধর্মরাজ পূজা করত।" কিন্তু দেখা যায় রাঢ়ে ডোমদের এলাকায় যত না বেশী পূজা হয়, দেবাংশীদের মধ্যেই এই পূজা বেশী মাত্রায় প্রবেশ করেছে। যদি

ধরা যায় বীরভূমে ডোমরা আজ দেবাংশীতে রূপান্তরিত হয়েছে ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তা সঠিক নয়। Risley তাঁর বিখ্যাত "TRIBES AND CASTES OF BENGAL" গ্রন্থে লিখেছেন "Deasi—a synonym for Lohar Maiyhi; Debangsi—a title of upcountry and Uriya Brahmins; Debansi—a sub-Tribe of Rajputs in Choto Nagpur, to The Rajas of Bishnupur, in Bankura, Profess to belong; Debansi—a class of Tiyars who are fisherman".

রিজলীর মতে ডোমদের উপাধি পণ্ডিত, তারা দেয়াসী বা দেবাংশী বলেও পরিচিত।

কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের বাস পাশাপাশি, বীরভূমে দেবাংশীরা এখন রাজপুত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং ধর্মরাজের পূজারী। ডোমেরা তপশীল রাঢ়ে ডোমদের এবং দেবাংশীদের Status সম্পূর্ণ আলাদা। তবে হোমের দায়িত্ব ব্রাহ্মণের, নিত্য পূজারও দায়িত্ব ব্রাহ্মণের। ব্যবসার দায়িত্ব দেবাংশীর। কুষ্ঠরোগ, বাত-এর অব্যর্থ ওষুধ দেন দেবাংশীরা। বীরভূমের মালবাড়ী বা বেলিয়া গ্রামের ধর্মরাজ খুবই জাগ্রত। আষাঢ় মাসের রবিবারে কাতারে কাতারে মানুষ যান বাতের ওষুধ আনতে। রাতমার ধর্মরাজও খুবই জাগ্রত। বিলসাগ্রামের একজন ঢাক বাজিয়ের কুষ্ঠ রোগ ভাল করেছিল দেবাংশী। তার জন্যে প্রায় ২০ বছর ধরে তাঁর বংশধররা ঢাক বাজিয়ে থাকেন বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজার সময়।'

বীরভূমের ধর্মরাজ ঠাকুর পূজা সাধারণত কোন গাছ তলায় হয়। হয়ত গ্রামের কোন বর্ধিষ্ণু মানুষের দানে বা চাঁদা করে কোথাও কোথাও ছোট ছোট মঠ তৈরী হয়েছে। এখানকার ধর্মরাজের নিত্য সঙ্গী ঘোড়া। কোন মানুষের মানতেই আসে এই সব ঘোড়া। যেমন অনেকেই পাঁঠা মানত করে। বুদ্ধ পূর্ণিমায় পাঁঠা বলিটা হিন্দুদের প্রতিহিংসার জন্যই। কারণ বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের লড়াই-এ হিন্দুদেরই হয় জয় ঘোষণা।

বীরভূমে সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি মিছিল : ছবি—লেখক
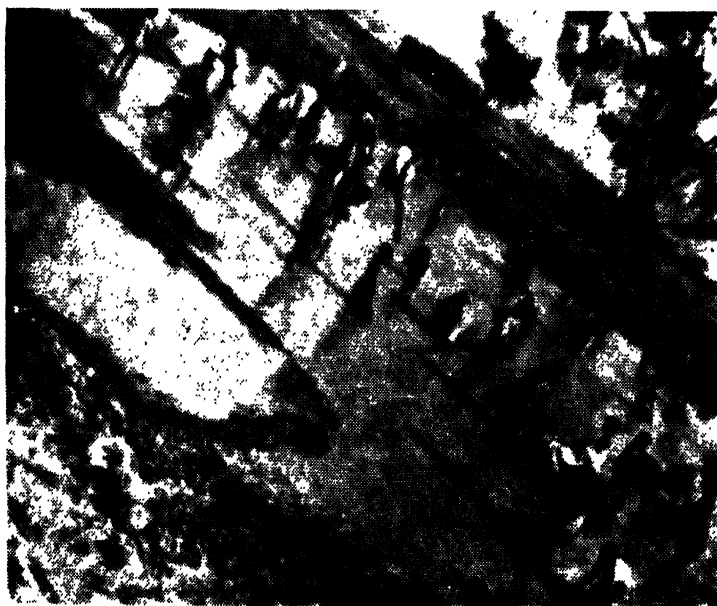
গ্রীষ্মকালে বীরভূমের জলাশয়গুলোর অবস্থা : ছবি—লেখক

পূর্ণিমার পাঁচ দিন কেউ কেউ তিন দিন আগে থেকে উপোস করে। বহু আগে চুল দাঁড়ি কামাতো, কিন্তু এখন শুধু দাড়ি কামায়। গলায় উত্তরীয় ধারণ করে। হাতে বেতের লাঠি। যার নাম দ্বাদশ। ভক্তরা এর পর ব্রাহ্মণদের সমান হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত স্তরের মানুষরাই ধর্মরাজের ভক্তা হতে পারে।

বীরভূমে বিশেষ করে কিছু কিছু গ্রামে যেমন রাতমা গ্রামে তিন দিন ধরে পূজা চলে। তিনটি নির্দিষ্ট পুকুর আছে। গ্রামের এই পুকুর তিনটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং গভীর। গ্রীষ্মকালে পূজা হয়। কিন্তু জল থাকে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু মণ্ডল পরিবারের কর্তার নাম অনুসারে দামোদর পুকুর বা দামার পুকুর। প্রথম দিন ভক্তরা যান এই পুকুরে স্নানের জন্য। বান গোঁসাই নামধারী একখণ্ড কাঠকে দেবাংশী কাঁধে করে নিয়ে যায়। এখানে ডোমদের কোন ভূমিকা নেই। ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত নির্দিষ্ট কোন জাতি নেই। দ্বিতীয় দিন গ্রামের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে পালিত পুকুর বা পাল্‌তা পুকুর। এই দিন জাগরণের দিন। সমস্ত রাত জেগে থাকতে হয়। তাই সারারাত ধরে চলে লেটো, বোলান, বা নানা ধরনের আঞ্চলিক গান। রাত জাগার ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক তথ্য না পাওয়া গেলেও দেবাংশীর নির্দেশ মতো এক জায়গায় থাকতে হয়। পরের দিন অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন যে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ থাকে তার পূর্ব প্রস্তুতি। এবং দেহ যাতে অপবিত্র হয়ে না যায় অর্থাৎ গৃহের মধ্যে সাংসারিক বা সামাজিক কার্য যাতে মন না যায় তার জন্যই মঠের সামনে রাত জাগার আয়োজন। দেবাংশীও সঙ্গে থাকে। নানান ধর্মীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়।

পূর্ণিমার দিন ভক্তরা দল বেঁধে যান আধকিয়ারী পুকুরে। গ্রামের একবারে উত্তর প্রান্তে। ধর্ম শিলাগুলো নিয়ে যান দেবাংশী। এখানে ব্রাহ্মণদের কোন ভূমিকা নেই। বান গোঁসাইকেও নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার ধর্মশিলাগুলোর আকৃতির কোন স্থিরতা নেই। শিলাগুলোকে যে ঝুড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় তা অবশ্যই জলে ডোবানোর পর সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনবার মাটিতে

নামানোর রীতি আছে। ধূপের ধোঁয়ায় দেবাংশীর ভরও হয়।

ধর্মরাজপূজার মধ্যে বিষ্ণু বা সূর্য কাউকেই বাদ দেওয়া হয় নি বলে মনে হয়। তবে কিছু কিছু লৌকিক আচার-আচরণ যুক্ত করা হয়েছে। তারপর আর একটা উল্লেখ্য অনুষ্ঠান হল দা-বাণ। এক-জন ভক্তা কলাগাছের মাচার উপর নয়টি দা এর উপর শুয়ে পুকুর ঘাট থেকে মণ্ডপে আসে। ইহা "নবখণ্ডসেবা"। লাউসেন তাঁর দেহ নয়খণ্ড করে হাকন্দ পুকুরের তীরে ধর্মরাজ পূজা করেছিলেন। রাতমার ধর্মরাজ পূজার দা-বাণ এরই অনুকরণে অভিনয় মাত্র। জিহ্বায় লেলি সনকা বাণ ফোঁড়া, কাঁটার উপর তাড়াতাড়ি দেওয়া ধূপ বাণ সব পূজার অঙ্গ। ধূপ বাণ হল দুই ধারে দুটি বাঁশ পুঁতে মাঝে একটি বাঁশ বেঁধে সে বাঁশে পা বেঁধে নিচু দিকে মুখ করে ঝুলে পুষ্পাঞ্জলি দেয় ভক্তারা। অনুষ্ঠানটি খুবই অভিনব এবং কষ্টকর, পাঁচদিন সংযমী হয়ে দুর্বল দেহে এই ধরনের অনুষ্ঠান মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

বীরভূম জেলায় ধর্মরাজ পূজা হয়ত সব সময় হয় না। আষাঢ় মাসে এই পূজার প্রচলন আছে। অনাবৃষ্টির সময় ও শরতেও ধর্ম-রাজ পূজার আয়োজন করা হয়। কথায় আছে প্রয়োজন আইন মানে না তাই পূজারও সময় থাকে না। অশ্বারূঢ় বীরভূমের ধর্ম-রাজ কখন কবিরাজ। কখনও জল দাতা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন; আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোঝাতে চেয়েছেন "ধর্ম-ঠাকুর মূলতঃ প্রাগার্য-সূর্য-দেবতা। এই বিষয়ে সংশয় করবার কোনও কারণ থাকতে পারে না।"

তাহলে ধর্মরাজ কি করে বাত বা কুষ্ঠরোগের প্রতিকারক হলেন। আবার ধর্মরাজের পূজা হয় শুক্লপক্ষে। আগে কথিত আছে ধর্ম-রাজ পূজায় সাদা পাঁঠা লাগতো। এখনও শ্বেতপদ্ম দিতেই হয়। ধর্মঠাকুরের বসন শুভ্র। আমরা জানি স্বর্গের দেবতা সরস্বতী এবং মহাদেবের বসন শুভ্র। তাঁরাই সর্বশুক্ল। এই ধারণা করাও অসম্ভব নয় ধর্মরাজ শিব। বীরভূমে সূর্য্যকে জবাকুসুমের সঙ্গেই তুলনা করে ("জবাকুসুম সংক্যাশম")। সুতরাং সেই অর্থে ধর্ম-

রাজ সূর্য দেবতা নয়। তবে মানুষের বিশ্বাসের কাছে কোন কিছুই লাগে না। ধর্মরাজ মূলত বিষ্ণু। তাঁকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাবে কল্পনা করা হয়। শিব সূর্য্য কেহই বাদ পড়েন না। ধর্ম-রাজের মঠের পাশে অনেক জায়গায় শিব মন্দিরও আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে যেমন ভাবে শিবের হোম, বাণ ফোড়া, ধূপবাণ হয়, বৌদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজাও ঠিক সেইভাবেই হয়। বীরভূমের চারিদিকে যে ভাবে শিবের মন্দির গড়ে উঠেছে তাতে এই ধারণায় বহন করে যে বৌদ্ধদের ঠেকানোর জন্য শৈবদের ভূমিকা ছিল সব চেয়ে বেশী। ধর্মরাজের মঠের পাশে বড় বড় শিবের মন্দির তার উদাহরণ। লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর প্রভাব আছে। গতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় এক এক সময় এক একটি ঢেউ এসেছে, যার প্রভাব মানুষের উপর যেমন ভাবে পড়েছে, দেবতাদেরও উপর ঠিক সেইভাবে পড়েছে, ধর্মরাজের দেবাংশীরা ধর্মরাজের গুরুত্ব মানুষের কাছে পেঁীছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

মনসা ঃ

"....সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি ॥
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন যা মনসা দেবী তেন যোগ্যেন দীব্যতি ॥
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
শিবশিষ্যা চ যা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্তিতা ॥"

মনসার জন্ম নিয়ে নানান মত প্রচলিত আছে। তবে বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মনসা কশ্যপ কন্যা। সর্পমাতা কদ্রুর গর্ভে মনসার জন্ম। অতঃপর জরৎকারু মুণির সঙ্গে বিবাহ। মনসা সাধনা বলে মহাদেব এবং বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন এবং বেদ

ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু এবং শিবের আশীর্ব্বাদ ধন্যা মনসা বীরভূমের শক্তিশালী দেবী।

বীরভূমের মানুষ সাপের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসা দেবীর কাছে আশ্রয় নেয়। মনসাকে কাঁচা দেবী বলে। ভারতবর্ষে সাপের পূজা খ্রীষ্ট পূর্ব থেকেই চলে আসছে। কারণ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গী এলিয়ণের বিবরণে ভারতবর্ষে সর্প পূজার উল্লেখ আছে। সাপ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে বেশী মাত্রায় সাপ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও আফ্রিকা জঙ্গলেও বিষধর সাপ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় কম। ভারতবর্ষের মানুষ খুবই ধর্ম ভীরু। সাপের সঙ্গে লড়াই-এ তারা পরাজিত। তাই আত্মসমর্পণ। কিন্তু আর্যরা নারী পূজার বিরোধী ছিল। সেখানে সর্প পূজা হত পুরুষরূপে। দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্প পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনও ভারতবর্ষে দ্রাবিড় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বিশেষ করে দক্ষিণ এবং মধ্যভারতে বসবাস করে তাদের মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন আছে। বৈদিক সাহিত্য এই পূজাকে বাদ দেয় নি। 'ঋগ্বেদে' সাপের যা পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সাপের ভয়াবহতার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের 'অহির্বুধ্ন্য' নামে শক্তিধর জীবটি অনেকের মতে সর্পরূপী দেব চরিত্র, ভারতবর্ষে বসবাসকারী বোড়ো, মিস্‌মিদের মধ্যে এবং ভারতবর্ষে আগত মোঙ্গলীয় জাতির মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদ এর পরবর্তী অথর্ববেদে সর্প পূজার, কয়েকটি মন্ত্রও আছে। সুতরাং বেদ থেকে সর্পপূজা বাদ পড়েনি।

মহাভারতে উল্লেখিত নাগ জাতি পাতালের অধিবাসী। এবং তারা আর্যবংশ—সম্ভূত। তাঁদের পিতা কশ্যপ মুনি এবং মাতা কদ্রু। কশ্যপ মুনির দুই পত্নী কদ্রু এবং বিনতা। কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাগ আর বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ।

মনসা মঙ্গল কাহিনী অনুসারেঃ চাঁদ সদাগর ছিলেন একজন দাম্ভিক শৈব। তাঁর ভয়ে স্বর্গের নাগগণ কাঁপত। মনসা হলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। একদিন শিব যখন বনের মধ্যে ফুল তুলতে যান তখন সমস্ত নাগগণ সরে পালালে মনসাদেবী নিরাবরণা হয়ে শিবের

সামনে দাঁড়ালেন। মনসাদেবী শিবকে অভিশাপ দিলেন তার অভিশাপে চাঁদসদাগর মর্তে জন্মগ্রহণ করলেন বিজয় সাধুর পুত্র রূপে। চাঁদসদাগরের কাহিনী থেকে জানা যায় মর্ত্যে মনসা দেবী তাঁর পুজো নেওয়ার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করেন। চাঁদের স্ত্রী সনকা মনসা পুজো করলেও চাঁদ অবিচল। অবশেষে চাঁদের কাছ থেকে মনসা পুজো আদায় করলে মর্ত্যে মনসা পুজার ব্যাপক প্রচলন হয়।

সর্পই ছিল মনসার প্রধান অস্ত্র, চাঁদসদাগরের কাহিনীর যৌক্তিকতা এইখানেই যে তাঁর পুজোর পরই মনসা পুজোর ব্যাপক প্রসারতা আজ যা রাঢ় ভূমির বিশেষ করে বীরভূমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পুজো।

অনেকের ধারণা মনসা সর্প দেবী জাঙ্গুলীর অপর নাম। বৌদ্ধদের যখন প্রচণ্ড দাপট, তখন বৌদ্ধরা জাঙ্গুলী দেবীর পুজো করতো। বাণভট্টের মতে "জাঙ্গুলিক" শব্দের অর্থ সাপুড়ে। কবি বিপ্রদাস মনে করেন "জাঙ্গুলি" মনসাদেবীর আর এক নাম। বৌদ্ধদের প্রভাব যতদিন জাঙ্গুলির অস্তিত্বও তত দিন ছিল। কিন্তু সেন রাজাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়। বৌদ্ধরা নিজেদের পরিচয়ও লুকাতে থাকে। ফলে "জাঙ্গুলী"ও পরিচয় লুকিয়ে মনসায় পরিণত হন।

কেউ কেউ মনে করেন মনসা শব্দের অর্থ "সীজ বৃক্ষ"। ইন্দোমঙ্গলীয় জাতির মধ্যে সীজ বৃক্ষের পুজোর প্রচলন আছে।

যদিও মনসা নামের সাথে সীজ বৃক্ষের নামের সম্পর্কটা লক্ষ্য করা যায় না। তবে সীজ বৃক্ষের তলায় পুজো হয়। এখন বীরভূমের বিভিন্ন মনসা মন্দিরে দেখা যায় মাটিকে লাড্ডুর মতো করে সীজবৃক্ষের ডাল পোঁতা থাকে। অনেক জায়গায় আবার ঘটের মধ্যেও ভরা থাকে। এই গাছকে বীরভূমে চলতি কথায় বলে "ফণি মনসা"। ইংরাজীতে যাকে বলে "cactus"। বীরভূমের মানুষ আবার ক্যাকটাস বলতে "গুরুম বেগুণ" বা "কণ্টকিয়েরী" অর্থাৎ ছোট ছোট কাঁটা গাছকেও বোঝে। যা অবশ্য বীরভূমে খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু "ফণিমনসার" গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে।

ভারতচন্দ্র বা মুকুন্দরামের মতো প্রথম সারির কবির অবির্ভাব না হলেও মনসামঙ্গলের প্রচার সর্বাধিক, তার একমাত্র কারণ সাপের ভয়। মনসার সঙ্গে যদি সাপ যুক্ত না থাকত তো মনসা 'ইন্দ্র পূজা' (লৌকিক) বা (লৌকিত) ইতু পূজার মতোই হত। মনসা পূজা রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করে বীরভূমেই বেশী প্রচলিত। তাহলে কি সাপের উপদ্রব এখানেই বেশী ছিল? চাঁদ সদাগরই বা কোথা-কার লোক?

কিন্তু তা নয় সর্পপূজা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত আছে। উত্তর বিহারে জনসাধারণের মধ্যে সর্প দেবীর পূজার প্রচলন আছে। তবে যেখানে বনভূমি বেশী ছিল এবং পাহাড়িয়া অঞ্চলে সাপের উৎপাত বেশী ছিল। সেখানটাই মনসা দেবীর পূজা বেশী হয়। মনসা পূজা আরোপিত পূজা নয়—সহজাত।

বীরভূমের নিম্ন বর্ণের মানুষদের বাড়ীতেই মনসা দেবীর অবির্ভাব। পূজা হয় দশহরা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে, ভাদ্র সংক্রান্তিতে এবং নাগ পঞ্চমীতে।

বীরভূমের ভূমিজ সংস্কৃতিতে ধর্মীয় প্রভাব ব্যাপক। বীরভূমে বেদিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ প্রচুর দেখা যায়। এক সময় এঁরা সাপ নিয়ে খেলা করত। এদের গানের মধ্যে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী, চাঁদ সদাগরের মানসিক দৃঢ়তার ছবি ফুটে উঠেছে চাঁদ সদাগরকে অনেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ বলে মনে করেন। এখন বেদিয়া-দের মধ্যে সাপুড়ে কম দেখা যায়। কারণ শিক্ষার আলো বেশ ভাল ভাবেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কবি বিজয় গুপ্ত যদিও পূর্ববঙ্গের, কিন্তু তাঁর কবিতায় রাঢ়ের রূপ ফুটে ওঠেছে। বেহুলা বা চাঁদ সদাগরকে তিনি রাঢ়ের মাটির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাঢ়ের মধ্যে বীরভূমের জনশ্রুতিতে যে মনসা বা লখিন্দরের কাহিনী প্রচলিত আছে তার উপর ভিত্তি করেই মনসা মঙ্গলে শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যিক প্রতিভা স্ফুরিত। এবং বীরভূম যে এককালে বনে পরিপূর্ণ ছিল তা ইতিহাস সিদ্ধ। এবং সাপের উপদ্রবও ছিল প্রবল।

বীরভূমের সর্বত্রই মনসা পূজা হয়। যেমন গঙ্গারামপুরের মনসার

খুবই নাম আছে। সমাজের মধ্যে যখন বসন্ত রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিত তখন মানুষ মনসার কাছে আত্মসমর্পণ করত। বসন্ত-কালে বা অন্য কোন সময় বসন্ত রোগের মহামারী দেখা দিলেই মনসা পূজার আয়োজন হয়। সুতরাং বীরভূমের মনসা শুধু সর্পের দেবী নন, বসন্ত, কলেরার মত ক্ষতিকারক রোগের বিনাশিনী দেবী। গঙ্গারামপুরের মনসার মাথায় তিনটি সাপের ফণা আছে। বেশ কয়েকটি মনসা মূর্ত্তি এখানে আছে। এই গ্রাম থেকে বিভিন্ন গ্রামে মনসা যায়। মনসা আর বায়েন বাগ্দীর নেই, এখন উচ্চ বর্ণের মানুষের।

এছাড়া পাহাড়পুর, হাতোরা, মাঝিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের মনসাও বিখ্যাত।

বীরভূমের সমস্ত গ্রামেই মনসা পূজা হলেও সমস্ত গ্রামেই মনসা মন্দির নেই। যে সমস্ত গ্রামে মনসা মন্দির আছে সেই সমস্ত গ্রামেই দেখা যায় মনসা দেবীর আবির্ভাব হয়েছে মাটি থেকে। মাটি ফুঁড়ে মনসার আবির্ভাব। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের বাড়ীতে। মনসা কথাটি এই সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের থেকেই উৎপত্তি। ধার করা শব্দ নয়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যে কয়েকটি মনসা-মূর্ত্তি বীরভূম জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরভূমের সমস্ত লৌকিক সংস্কারের মধ্যে মনসা দেবীর ব্যাপক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী বীরভূম জেলার কোন অঞ্চলে একদিন বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, এবং সেখান হইতে ক্রমে পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।"

মনসা দেবী, বীরভূমের জঙ্গলের দেবী। জঙ্গল থেকে জাঙ্গুলী। বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে এই মনসা দেবীর প্রথম আবির্ভাব। কারণ মনসা মূর্ত্তি শক্ত মাটির, পশ্চিমাঞ্চলের মাটিও খুবই শক্ত এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল! এখনও জঙ্গল আছে। আদিবাসীদের মধ্যেও কোথাও কোথাও মনসা পূজার প্রচলন আছে। সুতরাং এও অনুমান করা যায় যে বীরভূমের পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী-

দের বেশী বাস। রাঢ়ের এই উচ্চ ভূমি থেকেই মনসা পূজা শুরু হয়ে বীরভূম থেকে বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পুরাকীর্তি ও দ্রষ্টব্য স্থান

শিবপাহাড়ী ঃ বিহারের সংলগ্ন শিবপাহাড়ী কোন গ্রাম নয়। জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মল্লারপুর হতে ছয় কি. মি. পশ্চিমে গনপুরের নিকটেই এই এলাকা। চারিদিকে দুই কি. মি. করে বন। বনের মধ্যে পাঁচটি পাহাড় আছে। নানান গাছে পরিপূর্ণ এই পাহাড়গুলো বীরভূমের ঐতিহ্য বহন করছে। পাহাড়গুলো উপরে যে ছোট ছোট কালো পাথরগুলো দেখা যায় তাতে কোন ধর্মের নিদর্শন ফুটে ওঠে না, যা সহজাত। অর্থাৎ পাথুরে মাটি। এলাকায় যাতায়াত কারী বর্ষীয়ান মানুষদের কাছ থেকে জানা যায় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে যে শিব মন্দিরটি আছে তা রাজা জয়দ্রোত কতৃক প্রতিষ্ঠিত। জয়দ্রোত (মহাভারতের) এই গভীর অরণ্যে দীর্ঘদিন বসবাস করে-ছিলেন। এবং শিবের সাধনা করেছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিবের মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন রামপুরহাট নিবাসী "হরবংশ প্রসাদ এণ্ড সন্স" এর মালিক শান্তিলাল বাবু। মন্দিরটি আধুনিক এবং ছোট। প্রবাদ আছে মন্দিরের ছাদ করা যাবে না। তাই দীর্ঘ দিন মন্দিরের ছাদ বা চূড়া তৈরী কেউ করেন নি। এখন কিন্তু ছাদ হয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে হোম হয়। ভক্তের দল আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে। উপোস করে। বাণ ফোঁড়ে জিহ্বায়। পরিবেশ হয়ে ওঠে মনোরম। প্রাকৃতিক দৃশ্য অবশ্য বীরভূমের যত দর্শনীয় স্থান আছে তার চেয়ে শিবপাহাড়ীই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমৎ শম্ভুগিরি মহারাজ (গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জীর কাকা) দীর্ঘ দিন এই বনের মধ্যে বসবাস করেন, এবং সাধনা করেন। এইখানেই দেহ রাখেন। তাঁর সমাধি স্থলটিও বর্তমান। তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নেতাজীর খুবই ঘনিষ্ঠ।

জয়দ্রোত কতৃক প্রতিষ্ঠিত শিবকে কুখ্যাত কালাপাহাড় যখন মূর্ত্তি ধ্বংসে ব্রতী হন তখন পাঁচ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। অতঃপর

চারটি খণ্ডকে এক করে মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অপর খণ্ডটি বটবৃক্ষের নীচে।

শিবপাহাড়ীর আশে পাশে কিছু কিছু সাঁওতাল পরিবার বসবাস করে। উচ্চ শ্রেণীর বাস এখনও নেই। তবে প্রতি শনিবার এবং মঙ্গলবার মেয়েরা আসে দল বেঁধে পূজা দিতে। সম্পূর্ণ প্রকৃতির দান শিবপাহাড়ী। যার মধ্যে মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগে নি। তাই বড় সুন্দর।

দেবীদহ ঃ সতীপীঠ ফুল্লরা মায়ের পাদদেশে দেবীদহ। দেবীদহে দেখার মতো কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হয়ত নাই। তবে বিস্তৃীর্ণ মাঠের যে দিকেই তাকানো যায় শুধু ধান জমি আর জমি। নীল আকশের নীচে দেবীদহ আজও মানুষের মুখে মুখে। জমির মধ্য দিয়ে সরু একটা কাঁদর বয়ে চলে গেছে কোপাই নদীর দিকে। জল কোন দিনই শুকিয়ে যায় না। সামনে ছোটো লাইন। যার উপর দিয়ে বীরভূমের ভাষায় ছোট লাইনের ট্রেন যায়। জনশ্রুতি ঃ এই দেবীদহে অসুরের সঙ্গে দেবী দুর্গার প্রচণ্ড লড়াই হয়। অসুরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করে দেবী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর কপাল থেকে ১০৭ ফোঁটা ঘাম দেবীদহের জলে পড়ে। দেবীদহে আগে ধান চাষ হোত না। ছিল বিল, অর্থাৎ বিস্তৃীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল জলা জমি। ক্রমে ধানী জমি দেবীর কপাল থেকে ১০৭ ফোঁটা এবং শিবের কপাল থেকে এক ফোঁটা মোট ১০৮ ফোঁটা ঘাম রক্ত ঝড়ে পড়ে দেবীদহের জলে।

অসুরের সঙ্গে যখন চলছে প্রচণ্ড লড়াই তখন শিবও বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরও শরীর উত্তেজিত হয়ে পড়ে। দেহ ঘেমে ওঠে শিবও এসে পড়েন। কিন্তু দুর্গার অনুরোধে তিনি পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান।

তাঁদের এই ঘাম থেকে জন্ম নেয় ১০৮টি নীল পদ্ম। রামচন্দ্র যখন অকাল বোধন করেন তখন ১০৮টি নীল পদ্মের প্রয়োজন হয়। হনুমান দেবীদহ থেকে সেই নীল পদ্ম নিয়ে যান, কিন্তু যে পদ্মটি শিবের কপালের ঘাম থেকে হয়েছিল সেই পদ্মটি দেবী তাঁর পায়ে রাখতে না চাওয়ায় তিনিই লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু কাজের গতি

খারাপ দেখে এবং রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে দেখে শিবের অনু-রোধে পুনরায় পায়ে রাখেন।

দেবীদহ এখন সিক্তভূমি। অনেক দর্শনার্থী এখানে আসেন পুণ্য ভূমিকে প্রণাম করতে।

শান্তিনিকেতন ও পৌষ মেলা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম আলোচনার জন্য যখন নির্জন জায়গা, খুঁজছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর চোখে পড়ে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। অনুর্বর মাঠ। অবশ্য বোলপুরে আসার আগে তাঁর মন কেড়েছিল আউস গ্রামের কাছাকাছি ঐ রকম একটা মাঠ। কিন্তু সেখানে জায়গা পেতে ব্যর্থ হওয়ায় রায়পুরের জমিদারের কাছে আবেদন করেন। রায়পুরের জমিদার ভুবন-মোহন সিংহ তাঁর আবে-দনে সাড়া দেন! অতঃপর মহর্ষি ২০ বিঘা জমি মৌরসীসত্ত্ব কিনে নেন। জায়গাটি হয়ে ওঠে মনোরম দেবেন্দ্রনাথের স্পর্শে। ১৮৬৪ সালে শুরু হয় শান্তিনিকেতন নির্মাণ। চলতে থাকে ব্রাহ্ম ধর্মের আলোচনা সভা। দেবেন্দ্রনাথ কতৃক নির্মিত একতলা বাড়ীটিতেই বেশীর ভাগ সময় চলত আলোচনা। চারিদিকে গজিয়ে ওঠে নানান ধরনের গাছ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর সমস্ত কাজ করতে পারেন নি। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, এর একটা ট্রাস্ট ডিড করে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

পিতার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কার্যভার গ্রহণ করেন। পিতার অনুমতি ক্রমে এবং বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। দিনটি ৭ই পৌষ।

৭ই পৌষ দিনটির এতই তাৎপর্য কেন? তার কারণ ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণের দিন। সেই জন্য ৭ই পৌষ দিনটি রবীন্দ্রনাথের কাছে খুবই পবিত্র দিন। এই দিনটিতেই তিনি পৌষ উৎসবের সূচনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে ব্যাপকভাবে নেমেছিলেন। তথাকথিত সমাজে একটা ব্যাপক ছাপ ফেলার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম হলেও কাউকে তেমন পীড়াপীড়ি করেন নি। তিনি যদি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হতেন তাহলে হয়ত হিন্দু সংস্কারের সঙ্গে তাঁর শুরু হোত দ্বন্দ্ব। তবে পিতার উদ্দেশ্যকেও তিনি ব্যর্থ হতে দেন নি। উপাসনা বা উপাসনা মন্দির রক্ষা এবং Tradition ধরে রাখার জন্য যোগ্য উত্তর সূরীরও তৈরী করে গেছেন। রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার দিন ছিল বুধবার। বুধবার দিন উপাসনার দিন। সেই জন্য বুধবার বিশ্বভারতীর সব বিভাগেই ছুটি। রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত হতে পারেন নি। বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনে আজও ব্রাহ্ম সমাজের সুর প্রবাহিত।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুদূর প্রসারী করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছু গুণী মানুষকে নিয়ে আসেন। এঁরা হলেন তেজেশচন্দ্র সেন, কালীমোহন ঘোষ, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি।

শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল সার্বিক। অর্থাৎ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, নৃত্য, অঙ্কন, গানের সঙ্গে মেলাকেও যুক্ত করেছিলেন। মেলা থেকে হয় লোক শিক্ষা। সেই হেতু তিনি একদিনের মেলার আয়োজন করতেন—শিক্ষার একটা অঙ্গ হিসাবে। এই মেলার প্রধান বিষয় ছিল গ্রাম্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। তাই বাউল, লেটো, ঝুমুর, লোক সংগীত সবই পরিবেশিত হোত। মুসলমান ফকিররা প্রথমে আসতে দ্বিধাবোধ করলেও পরে দল বেঁধে এসেছে, এখনও আসে। মেলার দায়িত্ব থাকত বিশ্বভারতীর ছাত্র এবং কর্মীদের উপর—যা এখনও থাকে। কিন্তু এই মেলা দিনে দিনে বিশাল হয়ে ওঠায় একদিনের জায়গায় তিন দিন হয় এবং স্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। ৭ই পৌষ ছাতিম তলায় প্রত্যুষে সঙ্গীত আর মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মেলা।

বিশ্বকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটা নীড়ের মধ্যে মেলানোর পরিকল্পনায়—শান্তিনিকেতন। তাই তো তিনি নিয়ে এসেছিলেন

কলাভবনের প্রাণ পুরুষ নন্দলাল বসুকে। সৃষ্টি হয়ে ছিল ভাস্কর্যে রামকিংকর বেজ, ভিত্তি চিত্রে বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়।

তাই তো বিশ্বভারতী টানতে পেরেছিল—সিলভ্যাঁ লেভি, মরিট্স উইনটারনিট্স, ভিনসেণ্ট লেসনি, স্টেন কোনোর এর মতো পণ্ডিত বিদেশীদের।

অতঃপর বিশ্বভারতী ১৯৫১ সালে ১৪ই মে কেন্দ্র সরকারের হাতে চলে যায়।

পাথর চাপুড়ী ঃ

সমন্বয় সাধিত হয় প্রতিভার গুণে,
হিংসার আগুণ জ্বলে চণ্ডালের মনে।

মহাপুরুষদের জন্ম হয় ঠিক সন্ধিক্ষণে। যখন হয়ত জ্বলতে থাকে হিংসার আগুন। হয়ত শুরু হয় ভায়ে ভায়ে দ্বন্দ্ব, তখন সমন্বয়ের পথিক রূপে আমাদের সামনে আসেন মহাপুরুষেরা।

বীরভূম এর একটা উল্লেখযোগ্য পুণ্যভূমি পাথর চাপুড়ী। মহবুবশার মাজার আছে এখানে। তিনি দাতা বাবা নামে বিশেষ-ভাবে পরিচিত। দুই ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র এই পুণ্যভূমি পাথর চাপুড়ী।

মহবুব শার কাছে মানুষই ছিল ভগবান বা আল্লা। মানুষের দুঃখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়তেন। নিজের সবকিছুই দান করে দিয়ে সামান্য বস্ত্রে দিনাতিপাত করতেন। এই মানব প্রেমিক সাধক, দানকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করতেন। পার্থিব এবং অপার্থিব সম্পদও তিনি দান করতেন। সাধনার বলে তিনি যে শক্তি অর্জন করেছিলেন তার নমুনা আজও বর্তমান। এই দাতা বাবা কোথা থেকে এসেছিলেন কেউ বলতে পারেন না। অনেকে মনে করেন দাতা বাবা হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান। সামাজিক অত্যাচারে ফকিরের বেশে সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর মূর্খ বিবেকহীন মানুষদের কাছে তিনি কিছু জ্ঞানের কথা বলেন। বিবেকহীন মানুষেরা এই সমস্ত সিদ্ধ গুরুদের কাছ থেকে অনেক

সময় জ্ঞান পায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রমাণ বহন করছে।

পাথর চাপড়ী এককালে ঘন বনে ঢাকা ছিল। এলাকার মানুষ ছিল অশিক্ষিত। শিক্ষার আলো মোটেই প্রবেশ করে নি। তিনি বুঝেছিলেন এই এলাকার মানুষদের অজ্ঞানের অন্ধকার হতে তুলে আনতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সমতার বাণী প্রচার করতে হবে। তিনি সেই কাজে অবশ্যই সফল। মানুষ—মানুষ হিসেবেই পাথর চাপড়ীতে যায়—কোন জাতি হিসেবে নয়।

দাতা সাহেবের জীবনে এসেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত। কখন তাঁকে হতে হয়েছে মাষ্টার আবার কখনো রাখাল। তবে তিনি যে পথই ধরেছেন, সেখানেই কিছু না কিছু অলৌকিক ছাপ রেখেছেন। আলি সাহেব বা ভোলা খাঁ কেউই তাঁকে ধরে রাখতে পারেন নি।

যাঁর দৃষ্টি সর্বব্যাপী তিনি কি সিন্ধুকে বন্দী থাকেন। আসল মানুষকে চিনতে দেরি লাগে। বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটার পর দাতা সাহেবের নাম ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের ভীড় উপচে পড়ে পাথর চাপড়ীর কুঁড়ে ঘরে। কঙ্কাল সার জীর্ণ পোষাক ধারী মানুষটি মানুষের পূজার পাত্র হয়ে ওঠেন।

দাতা সাহেব কোন মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হলেও সহ্য করতেন। উপযুক্ত শিক্ষাও দিতেন। তিনি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারতেন। একবার হায়দ্রাবাদের নিজামের এক বংশধর এসেছিলেন দাতা-সাহেবের কাছে। তিনি দাতা বাবাকে ভুল বুঝেছিলেন। তাঁকে গাঁজার কলিকা এবং নারী পরিবেষ্ঠিত থাকতে দেখে মনে করেছিলেন দাতা সাহেব ভণ্ড। কারণ তাঁর কাজ শরীয়তের বিরোধী। কিন্তু তিনি তাঁর কোন কথায় প্রকাশ করেন নি। এই অপ্রকাশিত কথা গুলো দাতার অন্তরে বেজে ওঠে। এবং বলেন "তুই আমাকে ভুল বুঝলি তোর দুটো বিবি হবে।"

নিজামের বংশধরের হয়েও ছিল। এবং তাঁকে তাঁর পথেই থাকতে বলেছিলেন। দাতা সাহেব শরিয়ৎ মেনে চলতেন না। কারণ তাঁর মধ্যে যে সমন্বয়ী দেবতা বিরাজ করতেন তাতেই তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় পাত্র। দাতা সাহেব ১২৯৮ সালের ১০ই চৈত্র দেহ রাখেন।

দাতা সাহেবের মাজারটি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ১৯১৮ সালে। জেলা শাসক জি সি দত্তের নেতৃত্বে সভাপতি হন সেকেন্দার জমিদার খান বাহাদুর।

খান বাহাদুরের নেতৃত্বে শুরু হয় মেলা। আজও মহাসমারোহে মেলা হয় চৈত্র মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত। মেলাটি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে এই মেলায় বিভিন্ন জায়গা হতে। এত লোক সমাগম সাধারণত গঙ্গাসাগর মেলা ছাড়া কোথাও হয় না। বিভিন্ন সুহৃদয় ব্যক্তির দানে আজ দাতা সাহেবের সাধনা পীঠ অনেক উন্নত। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল কাশেম মোল্লা, চোয়াড়ী খাঁ, সাহাদৎ খাঁ প্রভৃতি।

আগম বাগিশের সমাধিক্ষেত্র

রাজা মল্লনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক কুমারীর গর্ভে। কুমারীর নাম পদ্মিনী, জাতিতে কলু, পদ্মিনীর বাবার নাম ছিল দামোদর মণ্ডল। দামোদর পাড়ে ছিল তাঁর বাড়ী, যা এখন মল্লারপুরের মধ্যে ঢুকে গেছে। বিহারের সংলগ্ন এই বিশাল এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পদ্মিনীর সঙ্গে ঘন জঙ্গলে দেখা হোত এক সন্ন্যাসীর। তাঁর বরে মল্লনাথের জন্ম। পদ্মিনীর গর্ভে অবৈধভাবে সন্তান এলে তাঁর পিতা তাঁর উপর কলঙ্ক লেপন করে বের করে দেন। পদ্মিনী মনের দুঃখে বনের মধ্যে চলে আসেন। এই খানেই মল্লনাথের জন্ম। কিন্তু মল্লনাথের বয়স যখন ৬ মাস তখন পদ্মিনী মারা যান। এই অসহায় অবস্থায় এসে উপস্থিত হন ঘন জঙ্গলে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশ। যিনি ছিলেন সাধক রামপ্রসাদের গুরু।

তাঁর সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেন এই মল্লারপুরে। তিনি রাজা মল্লনাথকে মানুষ করেন। তাঁরই সহযোগিতায় রাজা মল্লনাথ বিশাল এলাকার রাজা হন। অতঃপর আগম বাগিশের কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন তাঁকে ধ্যানস্থ অবস্থায় যেন

সমাধিস্থ করা হয়। তাই যখন তিনি ধ্যান করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে মাটির মধ্যে পুড়ে ইট দিয়ে গেঁথে দেয় শিষ্যরা। আজও সেই সমাধিটি মল্লারপুর শিবমন্দির চত্বরে বর্তমান।

কলেশ্বরের—কলেশনাথ :

"বাংলার মন্দির বাংলার জাতীয় তীর্থ। বাঙালীর অন্তর হৃদয়ের পরিচয় দিতে তার স্পর্শশীতলতার, তার আনন্দ বেদনার এবং সর্বোপরি তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইঙ্গিতে বাংলার দেব দেউলগুলি একান্তই অপ্রতিদ্বন্দ্বী"

["বাংলার দেব দেউল"—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়]

বীরভূম জেলার অতর্গত ময়ূরেশ্বর থানার একটা গ্রাম কলেশ্বর। কলেশ্বরের নিকটেই অবস্থিত ঢাকা গ্রাম। এই গ্রামের জমিদার ছিলেন রাজা রামজীবন। তাঁরই অমর কীর্তি কলেশ্বরের শিব মন্দির। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বজ্রপাতে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে আবার উদ্যম শুরু হয়।

কিন্তু মাথা হয়ে কাজ করানো লোকের অভাব হয়। তখন এলাকার মানুষের আবেদনে আসেন দ্বারিকানাথ দেব তপস্বী। যাঁর আসল নাম দুলাল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পিতা বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার হাজিপুর গ্রামে। ১৩৩২ সালে ২রা অগ্রহায়ণ দ্বারিকানাথ দেব তপস্বী শৈবতীর্থ কলেশ্বরে আসেন।

দ্বারিকানাথের বয়স যখন ১২-১৩ বছর তখন তিনি কাকীমার নিপীড়নে গৃহত্যাগ করেন। সেই সময় চলছিল গঙ্গা সাগরের মেলা। মেলা থেকে হরিহরানন্দ দেব তপস্বী ফিরছিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দ্বারিকনাথের দেখা হয়। তিনিই নাম দিয়েছিলেন দ্বারিকানাথ।

দেব তপস্বী কলেশ্বরের বজ্রপাতে ক্ষত বিক্ষত মন্দিরটি অকিঞ্চন দাসের সহায়তায় তৈরী করেন। তবে তাঁকে অর্থ দিয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন লালগোলার রাজাধিরাজ ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়।

মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত। উচ্চতা ১০৮ ফুট। মন্দির প্রাঙ্গণ এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দ্বারিকানাথের মূর্ত্তিটি সুন্দর ভাবে রাখা হয়েছে এই মন্দিরে। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন ডঃ নবকিশোর হাজরা এবং "কলেশ্বর—কলেশনাথ" বই এর লেখক ও কবি শুকদেব মিত্র।

"কলেশনাথ মন্দিরের পূর্বদিকে বারান্দার মাঝখানে ভক্ত ধ্রুব আর দু'পাশে দু'জন মুনিকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখা যায়। তাঁদের দুপাশে পাহারায় গর্জনরত দু'টি সিংহ দণ্ডায়মান।"

এর নিচে অঙ্কিত আছে—

ওঁ নমঃ শিবায়

সন ১৩৪৬ সাল, ১৮ই ভাদ্র

একটু নিচে—

৺কলেশনাথ মহাদেব বিজয়াতাং

বাং—১৮।৫।৪৬

তবে কলেশ্বরে ৺কলেশনাথের নূতুন শিব মন্দির ৺পার্বতীমাতার নতুন মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৪৭ সালের ২৮শে মাঘ, মাঘি পূর্ণিমার দিন।"

[কলেশ্বর—কলেশনাথ—শুকদেব মিত্র]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মন্দিরের সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ এক সঙ্গে হয় নি। শুকদেব মিত্র মহাশয় এ কথাও বলেছেন এই মন্দির নির্মাণে সময় লেগেছিল পনের বছর দুই মাস ষোল দিন। এবং খরচ হয়েছিল এক লক্ষের উপর টাকা। টাকার বেশী ভাগটায় দিয়েছিলেন লালগোলার রাজাধিরাজ।

শিব চতুর্দ্দশীতে হয় বিরাট মেলা। সাঁইথিয়া হতে কান্দী যাওয়ার রাস্তায় পড়ে কলেশ্বর মোড়। এই মোড় থেকে আবার পাকা রাস্তা চলে গেছে মন্দিরের পাশ দিয়ে লোকপাড়া।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন বীরভূমে বীর সন্তান জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্দির নির্মাণের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

ভাবুক: ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত বীরচন্দ্রপুরের সংলগ্ন গ্রাম

ডাবুক। বামাক্ষ্যাপার সমসাময়িক সিদ্ধ পুরুষ কৈলাশপতি এখানে ১২৮৭ সালে একলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটির উচ্চতা ৮০ ফুট। কৈলাশপতির বাবা বসবাস করতেন ডাবুক হতে তিন মাইল দক্ষিণে দক্ষিণগ্রাম বলে একটা গ্রামে। পাশের গ্রাম রাতমায় বসবাস করতেন এবং বাড়ী বামদেবের গুরু মক্ষদানন্দ, বৌদ্ধ দর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং নবনালন্দা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মক্ষদানন্দের বংশধর। কৈলাশপতিবাবা ছিলেন কাশ্মীরের রাজাদের বংশধর। সেই হেতু প্রতি বছর ডাবুকে মন্দিরের পুজার জন্য ৬০০ টাকা করে আসত। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত। নাটমন্দির আছে। "Temples of Birbhum" গ্রন্থে সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও এই মন্দিরে পুজো দেয়। এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেবতা বলে মনে করেন।

গণুটিয়া ঃ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত ময়ূরাক্ষী নদী তীরস্থ গনুটিয়া গ্রাম কৃষিকার্যে খুবই উন্নত। ইংরেজ আমলে "বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর" রেশম কুঠীগুলো এখানেই অবস্থিত ছিল। একশত কুড়ি বিঘা এলাকা জুড়ে এই কুঠির চত্বর। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ফ্রসাড নামে এক Agent-কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিযুক্ত করেন। রেশম কুঠী ছিল তখন জমজমাট। প্রায় চার হাজার লোক কাজ করতেন এই কুঠীতে। মিঃ ফ্রসাড সাহেব ছিলেন অত্যন্ত কাজের লোক। মানুষ ভালবাসতেন তাঁকে। তিনি ১৭৮৫ খ্রীঃ এডওয়ার্ড হের এর নিকট ২০,০০০ টাকা মূল্যে কুঠী ক্রয় করেন। রেশম কুঠীর কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ ময়ূরাক্ষীর বন্যায় কুঠীর প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রায় ১৫,০০০ টাকা ক্ষতি হয় কোম্পানীর। অতঃপর কোম্পানীর তরফ থেকে ময়ূরাক্ষীর ধার বাঁধানো হয়। আজও যার ধ্বংস স্তূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৮০৭ খ্রীঃ ফ্রসাডের মৃত্যু হয়। এরপর আসেন মিঃ চিপ সাহেব। তিনি কুঠীর দায়িত্বে ছিলেন ১৮০৭—২৮। Govt.কে তাঁকে বাৎসরিক ৩৪১৫, টাকা খাজনা হিসাবে দিতে হোত। অতঃপর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই কুঠীর মধ্যে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর

সমাধি বর্তমান। চীপ সাহেবের মৃত্যুর পর আসেন মিঃ সেক্সপিয়র Commercial Resident হিসেবে। এখন কুঠীর চত্বরে শুধু গাছ আর গাছ। এখন মালিক হিসেবে এসেছেন বীরভূমের দুই সন্তান। এঁদের মধ্যে একজন হলেন স্বনামধন্য উকিল অপর জন ডাক্তার। তবে আর রেশম কুঠী নেই, হয় ফলের চাষ।

মুণ্ডুমালাতলা: বর্তমানে তারাপীঠ বলতে সবাই জানে তারাপীঠ বাজারের মধ্যে বিশাল মন্দিরটি। কিন্তু আলোচনায় ঝড় উঠেছে; আসল কালীর স্থান মুণ্ডমালীতলায়। স্থানটি হচ্ছে তারাপীঠ নদীর উপরে ব্রীজের উত্তর দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে ওই রাস্তার পাশে—ঠিক নদীর উপরেই।

তারাপীঠের মূল মন্দিরটি হল তৃতীয় মন্দির। তৈরী করেছিলেন আজ থেকে ১৫০ বছর পূর্বে মল্লারপুরের রাজারা। আসল মন্দিরটি নদীর গর্ভে। এই আসল মন্দিরের স্থানটি আবিষ্কার করেছেন সিদ্ধ পুরুষ সন্ন্যাসী গোঁসাই (ছোট বাবা)। তিনি চৌদ্দ বছর কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। এবং ঐ চৌদ্দ বছরের বেশী ভাগ সময়েই তিনি বেলপাতাও জল খেয়ে কাটিয়েছেন। তিনি সাধনবলে জানতে পারেন যে বশিষ্টদেব যখন জলপথে তারাপীঠ আসেন তখন প্রথমে ওঠেন এই মুণ্ডমালীতলায়। এখানে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় দেখেন মা তারা নগেন্দ্র বালিকা রূপে স্নান করছেন। তিনি মহা সরস্বতী রূপ দর্শন করেন। মা যখন স্নান করছিলেন তখন তাঁর মুণ্ডমালাটি ঘাটে খুলে রেখেছিলেন। যেহেতু মুণ্ডমালাটি ঘাটে খুলে রেখেছিলেন সেই হেতু এই জায়গার নাম হয়েছে মুণ্ডমালীতলা। "মূল পৃথিবীর" সাধক এও জানিয়েছেন যে জয় দত্ত নামে এক বণিক নৌকো ভর্তি করে গৃহ কার্য্যে ব্যবহারের জন্য কিছু মাল আনছিলেন। বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতকারী এই মালগুলো অপহরণের চেষ্টা করলে তা আঙারে" পরিণত হয়। এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্যও এই ঘাটের নাম হয় দহ্‌-কাঁদির সতী মায়ের ঘাট।

চৌদ্দ বছর সাধনার পর, সন্ন্যাসী গোঁসাই ১৯৮০ সালে মুণ্ডু-মালীতলায় মায়ের (মহা সরস্বতীভাবের) এবং দহ্‌কাঁদির ঘাট

প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেছেন--যে বশিষ্টদেব শুধু তান্ত্রিক তারামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন নি। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই তারা যিনি বৈষ্ণব এবং শাক্তের সমাজদার। সেভাবে মূর্ত্তি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন—নগেন্দ্র বালিকার মূর্ত্তি। এই সন্ন্যাসী গোঁসাই কতৃক প্রতিষ্ঠিত নির্জন প্রান্তে মন্দিরে আজ মানুষের টান প্রবল—হয়ত একদিন আসল মন্দিরকে ছাড়িয়ে যাবে।

ভাণ্ডীরবন ঃ

রসাব্ধি ষোড়শ শকে সংখ্যকে শাস্ত্রসম্মতে
রামনাথ দ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাদুড়ী কুল কুল সম্ভবঃ।
ভাণ্ডীশ্বরং শিবং দৃষ্টা একান্ত ভক্তি সংযুতঃ
তৎ প্রীত্যর্থে বিনির্ম্মায় ইষ্টকময় মন্দিরং ॥
বিচিত্রং রচিতং রম্যং রজতাভাং পরিষ্কৃতং
দদ্যৌ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমাত্মাণ
যাচতে তৎপদে ভক্তিং মুক্তিং বা দেহি শঙ্করে ॥"

বিবরণে জানা যায় মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত। উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৪ খ্রীঃ।

ডেভিড ম্যাকাচ্চনের বিবরণেও জানা যায় মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত। প্রকৃত প্রস্তর নির্মিত নয়। কারণ অনেকের ধারণা মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত। কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত।

জয়দেব কেন্দুবিল্বঃ

অজয় নদীর তীরে অবস্থিত কেন্দুবিল্ব। "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ অমর করেছে জয়দেবকে, পদ্মাবতীকে। কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলীকে দিয়েছে মহাপীঠের মর্য্যাদা। আর পার্শ্ববর্ত্তী অজয় নদকে দিয়েছে অন্ততঃ পৌষ সংক্রান্তির ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তকে দিয়েছে গঙ্গার সমতুল্য শিবাণীর জাত।"

কবি জয়দেবের কাব্য মধুর। তার সূক্ষ্ম অনুভূতির ফসল বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাই বীরভূমবাসী ধন্য।

জয়দেব পূজিত রাধাবিনোদ মন্দিরটির নির্মাণকাল নিয়ে বেশ সংশয় দেখা দিয়েছে। অনেকের ধারণা মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আবার অনেকে মনে করেন নির্মাণকাল ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দ। এর একটা বড় কারণ মন্দির গাত্রে গ্রথিত পাষাণ ফলকটি ভেঙে পড়া।

অর্ণব মজুমদার খুবই দুঃখ করে বলেছেন—"বীরভূমের প্রাচীন মন্দির লিপিগুলি নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন সমীক্ষা হয় নি। হলে বীরভূমে শকাব্দের প্রভাব, চৈতন্যোত্তর কালে শিব ভাবধারার প্রসার অর্থসামাজিক বিন্যাস ও সেদিনের গণচৈতন্যের ধর্ম ও জাতপাতের অবস্থান নিয়ে এক ঐতিহাসিক নবপত্রাঙ্ক রচিত হতে পারত।

গর্ভবাস

ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত বীরচন্দ্রপুর বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের পূর্বপার্শ্বস্থিত একটা সুন্দর জায়গা, যেটি গর্ভবাস বলে পরিচিত।

পদ্মাবতীর গর্ভে এইখানে ১৩৯৫ শকে মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন।

গর্ভবাস কথাটি এসেছে এক প্রবাহ বাক্য থেকে। পদ্মাবতী যখন গর্ভবতী তখন একযোগী এসে উপস্থিত হন। তিনি পদ্মাবতীর গৃহে এসে নৃত্য করতে থাকেন। তাঁর এই নৃত্য দেখে বেশ কিছু মানুষ এসে উপস্থিত হন। এবং করজোড়ে বলেন—"আপনি কি বলছেন, আমরা বুঝতে পারছি না।"

তখন যোগী বলেন "এই পদ্মাবতীর গর্ভে আসছেন শ্রী বলরাম। এখানে তাঁর গর্ভবাস"।

তখন থেকেই জায়াগাটির নাম গর্ভবাস, যোগীর কথামত নির্দিষ্ট দিনে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্ম হয়। "তাঁর জন্মস্থানের উপর একটি ছোট প্রাচীন মন্দির আজও বিদ্যমান তাকে বলা হয়

সূতিকা মন্দির। একটি বকুল বৃক্ষ ছিল—শোনা যায় সেই বৃক্ষমূলে নিত্যানন্দের নাড়ী পোঁতা হয়েছিল। উত্তর দিকে একটি পুকুরের নাম পদ্মাবতী ...”

বীরভূমের একটি দর্শনীয় স্থান। দানী হাড়াই পণ্ডিত পুত্রকে ভিক্ষা স্বরূপ দান করেছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গৃহ ছাড়ছে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়।

“ভক্তিরসে জড় প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো ওঝা হৈলা পাগল॥
তিন মাস না করিলা অন্ন গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিলা জীবন॥”

* * * *

চারিদিকে শোকের ছায়া পড়ে যায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুরু হয় তীর্থ পরিক্রমা। এরপর গৌর-নিতাই এর মিলন হয় নদীয়ায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্ম ধন্য বীরচন্দ্রপুর—গর্ভবাস।

বক্রেশ্বর

উষ্ণ প্রস্রবন

বীরভূমের একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান বক্রেশ্বর দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত। এখানকার মূল মন্দিরটি রেঘদেউল রীতিকে অনুসরণ করে তৈরী। “পীঠ নির্ণয় তন্ত্র” অনুসারে সতীর মন পড়েছিল। সেই হিসেবে বক্রেশ্বর সতীপীঠ। শুধু সতীপীঠ হিসেবে নয় বক্রেশ্বর মহাপীঠের খ্যাতির অন্যতম কারণ এই তীর্থক্ষেত্র দুর্লভ প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সমস্ত উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তির কারণ এখন জানা গেছে, যদিও পৌরাণিক ব্যাখ্যা থাকলেও বৈজ্ঞানিকগণ সঠিকভাবে তা প্রমাণ করেছেন।

প্রস্রবণে জলের উষ্ণতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন জল গরম হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমতঃ বৃষ্টির জল ভূগর্ভে গিয়ে উত্তপ্ত শিলার স্পর্শে তা গরম হয়। দ্বিতীয়তঃ

ভূগর্ভে উত্তপ্ত পদার্থ থেকে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। ঐ শিলার স্পর্শে সংশ্লিষ্ট জল উষ্ণ হয়। ভূগর্ভে ঐ জল অন্য জলরাশিকে উত্তপ্ত করে তোলে। ফলে জল গরম হয়।

ভারতবর্ষে সাধারণত চার ধরনের উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যথা ১। বিশুদ্ধ ২। লবণ যুক্ত ৩। গন্ধক যুক্ত ৪। ক্ষার যুক্ত।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন বক্রেশ্বরে যে প্রস্রবণগুলো দেখা যায় তা গন্ধক এবং ক্ষার যুক্ত।

বক্রেশ্বরে মোট ৯টি প্রস্রবণ আছে। তার মধ্যে আটটি উষ্ণ জলের একটি শীতল জলের।

প্রস্রবণ জলের নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ভৈরব কুণ্ড ঃ জলে তাপমাত্রা প্রায় ৬৫° সেণ্টিগ্রেড। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

ক্ষার কুণ্ড ঃ উচচ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর তাপমাত্রা প্রায় ৬৬০ সেণ্টিগ্রেড।

অগ্নি কুণ্ড ঃ অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী। স্বর্ত্তক প্রাচীর পরিবেশিত। তাপমাত্রা প্রায় ৭২° সেণ্টিগ্রেড।

সৌভাগ কুণ্ড ঃ এখানকার জলের উষ্ণতা কম। তাই প্রাচীর-গুলো নিচু। কুণ্ডটি আয়তকার। বিভিন্ন তিথিতে জলের রঙ বদলায়, তাপমাত্রা ৪৩° সেণ্টিগ্রেড প্রায়।

জীবৎস কুণ্ড ঃ মূল মন্দিরের পশ্চিমাংশে এর অবস্থান। জলের উষ্ণতা স্বাভাবিক।

শ্বেত গঙ্গা ঃ ব্রহ্ম কুণ্ড এবং শ্বেত কুণ্ডের মধ্যে একটা যোগ-সূত্র আছে। ফলে ব্রহ্মের উত্তাপ আসে শ্বেতে। স্নান করার ব্যবস্থা আছে। তাপমাত্রা ৪২° সেণ্টিগ্রেড (প্রায়)।

ব্রহ্মা কুণ্ড ঃ তাপমাত্রা ৪৫° সেণ্টিগ্রেড (প্রায়)।

সূর্য্য কুণ্ড ঃ আয়তনে ছোট। তাপমাত্রা ৬৫.৮° সেণ্টিগ্রেড।

বৈতরণী (কুণ্ড) ঃ বৈতরণী শব্দের সঙ্গে একটা নদীর সম্পর্ক সব সময়েই মনে পড়ে। কথায় আছে বকনার লেজ ধরে বৈতরণী পেরুলে 'স্বর্গে' যাওয়া যায়। এখন বৈতরণী মানুষের স্নানের উপ-যুক্ত কুণ্ড। ষাটের দশকে বৈতরণীকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে উষ্ণ জলের

'রিজার্ভড ট্যাঙ্ক' করা হয়েছে। ভৈরব ক্ষার ও অগ্নি কুণ্ডের জল এসে এখানে জমা হয়। তারপর 'স্লুইস ভালবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে মহিলা পুরুষদের স্নানক্ষেত্রে আসে'।

'তীর্থময় বীরভূম' গ্রন্থ প্রণেতা মুক্তিপদ দে মহাশয়ের সংগ্রহে জানা যায় ঃ

"১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আলোচিত হয়, যে উষ্ণ প্রস্রবনের জলে বিভিন্ন ধরনের অসুখের জীবাণু নষ্ট হয়। কারণ এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ আছে। যে সমস্ত পদার্থ আছে তা হল Alkaline, radio emanative (due to padon content) এই জল ওষুধ এবং পানীয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য। Hyper acidity chronic liver disease, Arthitis, Rheumatism, High blood Pressure, Insomnia, Arteriosclerosis catarrh of the lung and Ordinarydigestive disorders এই জলে বিশেষ কার্যকরী"।

উষ্ণ প্রস্রবণে বেশী পরিমাণে সোডিয়াম ধাতু আছে। তবে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাসিয়ামও কম পরিমাণে আছে। এছাড়া ক্রোমিয়াম, এ্যান্টিমণি লিথিয়াম, রুবিডিয়াম, জেলিয়াম ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতুও যথেষ্ট আছে।

প্রস্রবণ হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনাক্সাইড মিথেন, ইথেন নাইট্রোজেন, সালফুরোডি-হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস নির্গত হয়।

উষ্ণ জলের AVERAGE COMPN. and NATURE ঃ

Ph-9·0 (ph—হাইড্রোজেন-আয়রন কন্সেন্ট্রেশন)

Culcium + (ca)	parts per Million	1·56
Magnesium (Mg)	,,	·46
Sodium (Na)	,,	135·2
Potassium (K)	,,	2·0
Chloride (Cl)	,,	88 0
Fluoride (F)	,,	7·4
Sulphate (So_4)	,,	27·1

Carbonate (CO_3)	„	34·8
Bicarbonate (HCO_3)	„	90·76

গবেষকরা প্রমাণ করেছেন বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণগুলো ক্ষার জাতীয়। কারণ এখানে সোডিয়ামের ভাগ বেশী।

বীরভূমের শিল্প ঃ

শিল্পে বীরভূমের ভূমিকা নগণ্য। ভারী শিল্প নেই বললেই চলে। বীরভূমের পাশের জেলা বর্ধমান শিল্পে খুবই উন্নত। বড় বড় শিল্প নগরী গড়ে উঠেছে। আউল-বাউল এর জেলা বীরভূমে যে সমস্ত শিল্পগুলো গড়ে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মৃৎ ঃ—বীরভূমের এখনও বেশ কিছু লোকের জীবিকা মৃৎ শিল্প। বীরভূমে এই মৃৎশিল্পে উন্নত একটি গ্রাম দক্ষিণ গ্রাম। প্রায় দেড়শ পরিবারের জীবিকা এই মৃৎশিল্প। এছাড়াও বেশ কিছু গ্রামের মানুষ মাটির তৈরী হাঁড়ি-কলসী তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। কোন পুকুর বা নদীর ধার থেকে মাটি এনে তৈরী হয় বিভিন্ন ধরনের হাঁড়ি, জার, সরা প্রভৃতি জিনিস। তারপর সে-গুলো এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে বিক্রি হয়। মৃৎ শিল্পীদের বলে "কুম্ভকার", অধিকাংশেরই পদবী "পাল"। শ্রীনিকেতন—শান্তি-নিকেতনে যেমন পাওয়া যায় পোড়া মাটির নানান মূর্ত্তি, ফুলদানী প্রভৃতি তেমনি গ্রামাঞ্চলে সংসার কর্মে, ব্যবহৃত জিনিস-পত্র। কাঁচা মাটিকে ছাঁচে ঢেলে একটা ব্যবহার্য জিনিস তৈরী করে 'আনে' সেগুলো পোড়ানো হয়। বীরভূমে টেরাকোটার ব্যাপক প্রচলন আছে। কুম্ভকারদের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। কারণ তাদের তৈরী জিনিস পত্রের মূল্য খুবই নগণ্য। বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে মৃৎশিল্পের উপর টিকে থাকা দুরূহ। যদিও সরকারী ঋণ ও অনুদান জুটছে। কিন্তু বাজার উচচ না থাকার জন্য ক্রেতার স্পৃহা কমে আসছে। তবে বীরভূমের একটা ঐতিহ্য এই পোড়া মাটির বাসন।

তাঁত ঃ শুধু তাঁতিরাই যে তাঁত বোনে তা নয়। তাঁত এখন

ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। অনেকেরই পেশা এখন তাঁত। বীরভূমে বিভিন্ন ধরনের তাঁতশিল্প রয়েছে। রেশম তাঁত, মশারী-গামছা-ব্যাগ এবং সুতীর কাপড়।

রেশম বা সিল্কের কাপড় যাঁরা বোনে তারা বীরভূমের ঝারগ্রাম বা তাঁতীপাড়া প্রভৃতি জায়গা হতে মহাজনদের কাছ থেকে 'পঠিয়া' বা 'ভন্‌না' নিয়ে আসে। বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্ষুদ্র তাঁত ব্যবসায়ীরা মহাজনদের কবলে পড়ে থাকে। বার হাত বা চব্বিশ হাত কাপড়ের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ খুবই কম। সব সময় অবশ্য পারিশ্রমিকের হার সমান থাকে না।

বীরভূম জেলার বিষ্ণুপুর বসোয়া গ্রামে তাঁতীদের সংখ্যা সর্বাধিক। বৃটিশ যুগে বীরভূমের উল্লেখযোগ্য রেশম কুঠি ছিল গানুটিয়ায়। তবে সেখানে স্বাধীনতা ছিল না। এখন স্বাধীন দেশে তাঁতিদের স্বাধীনতা থাকলেও আর্থিক কারণে তাঁতীরা জর্জরিত, তুলনামূলকভাবে মাঁটাসিয়ার মুড়াডিহি কলোনীর তাঁতিরা উন্নত। কলকাতা থেকে সুতো কিনে এনে তাঁতে বিভিন্ন ধরনের কাপড় বুনে বিক্রি করে। এখানে প্রায় দেড়শ ঘর তাঁতির বাস। দিন দিন বাড়ছে।

ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে এই কলোনী গড়ে উঠেছে। সমস্ত তাঁতীরা বাংলাদেশ থেকে আগত, অসম্ভব পরিশ্রমী। ফলে চরম উন্নতি।

তাঁত শিল্প বীরভূমের অর্থনীতিতে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। স্বনির্ভরশীল প্রকাশের মধ্যে বীরভূমে তাঁত শিল্পই এগিয়ে। কিন্তু রপ্তানীর বাজার খুবই খারাপ এবং কাঁচা মালের আমদানীও খুবই কম।

মুড়াডিহি কলোনীর তাঁতের বাজার আজ সারা ভারতে। এখানকার তাঁতীরা বাজার study করে। ফলে মানুষ চাহিদা মতো কাপড় পায়।

ডোম শিল্প : বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এরা বাঁশের তৈরী নানান ধরনের ঝুড়ি, টুপি বুনে বাড়ী বাড়ী বিক্রি করে। তালপাতার ছাতা তৈরীতে

ডোমরা খুবই পটু। বর্তমানে সরকারী ঋণ ও অনুদানে পুষ্ট হয়ে ব্যবসার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে অধিকাংশই গরীব। বীরভূমে ময়ূরেশ্বর থানায় বেশ কিছু ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বসবাস করে।

সূত্রধর ঃ বীরভূমে চলতি কথায় যাদের বলা হয় ছুতোর। কিন্তু পদবী সূত্রধর। বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ছড়িয়ে আছে। এদের কাজ কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরী করা। সূত্রধরদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। কারণ কাঠের তৈরী জিনিষপত্রের চাহিদা প্রচুর। লাভ হয় ভাল।

নাটক :

বীরভূমের মানুষের কাছে নাটকের প্রভাব খুব একটা বেশী নয়। সাধারণত শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং কৃষিজ সংস্কৃতিতে যাত্রার প্রচলন বেশী। নাটকের প্রভাব কম থাকার কারণ হচ্ছে ধৈর্য্যের অভাব, বোধশক্তির অভাব এবং অর্থাভাব।

পূর্বে নাটক যেভাবে পরিবেশিত হোত তা হচ্ছে তিনদিক বন্ধ করে মঞ্চ তৈরী হোত। এবং মাঝে মাঝে ড্রপসীন ফেলে মঞ্চ সাজানো হোত। যার ফলে মানুষের ধৈর্যে বিচ্যুতি ঘটত। বর্তমানে নাটক অবশ্য সেইভাবে পরিবেশিত হয়না। এখন নাটক সাধারণতঃ তিন দিক খোলা মঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে। তবে মঞ্চ সাজানোর সময় লাইট অফ্ করা হয়। সে যুগে বিদ্যুতের আলোর প্রচলন ছিল না। কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালিয়ে মঞ্চ তৈরী হোত। তবে নাটকের প্রচলন সে ভাবে ছিল না। যেমন ডি. এল রায় এর সাজাহান বীরভূমের মাটিকে উত্তাল করে দিয়েছিল। এখানে কোন পেশাদারি থিয়েটার গ্রূপ নেই। হয়ত কোন গোষ্ঠীর কোন পরিবেশন উৎকৃষ্ট হল। মুগ্ধ হয়ে অন্য গ্রামের বা শহরের লোক বায়না করত। বীরভূমের একটা বৈশিষ্ট গ্রামের কোন থিয়েটার গ্রূপ শহরে নাটক পরিবেশন করতে আসে না। তার মূল কারণ কাহিনীর তুলনায় গ্রামের দল কম পটু।

বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখা গেছে এখানে কোন সামাজিক নাটক থেকে ঐতিহাসিক নাটক দর্শক বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে। এর কারণ হতে পারে ডায়ালগ, উজ্জ্বল পোশাক এবং বিষয়। বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কয়েকজন নাট্যকার নাটককে সর্বজন গ্রাহ্য করেছিলেন তাঁরা সমাজকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। বাংলার বুকে যখন চলেছে নৃশংস অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা তখন জেগে উঠেছে, 'নীল দর্পণ'। মধুসূদন বা রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাট্য সাহিত্যকে দিয়ে গেছেন তাঁদের পরিত্রানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বলটুকু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজ জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শুরু হয় মন্বন্তর। মৃত্যুর মিছিলে শুধু মৃত্যু। সংস্কৃতিতে আসে অপসংস্কৃতির ঢেউ। চারিদিকে শুরু হয় লুটতরাজ, হিংসার আগুণ দাও দাও করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু 'নাটক উপেক্ষা করতে পারে না যুগের দাবীকে'। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য্য 'নবান্ন' রচনা করে নাট্য আন্দোলনের একটা দিগন্ত উন্মোচিত করেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় বংলা নাট্য জগতে। যার প্রভাব বীরভূমেও পড়ে।

বীরভূমের নাট্য আন্দোলনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সর্বাধিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের মাটিকে প্লাবিত করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির রূপ তার নাটকে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ রূপকের আশ্রয়ে অচলয়াতনে ভারতবর্ষের সংকীর্ণতার রূপ তুলে ধরেছেন। তাঁর 'রক্তকরবী' ভারতীয় সরল জীবন ধারায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এক বাধা। যন্ত্র মানুষকে কত যন্ত্রণা দেয় রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। মোহগ্রস্থ মানুষের কাছে এই পৃথিবী কত কঠিন তা তিনি অনুভব করেছিলেন।

গান্ধীজী বলেছিলেন "Village is the soul of India...." অসংখ্য হরিজনদের বাস এইখানে। জাগরণ হয়ত একদিন আসবেই, প্রস্তুতি চলছে। ভারতবর্ষের প্রকৃত রাজনীতি বুঝতেন গান্ধীজী। আর ভারতবর্ষকে বুঝতেন রবীন্দ্রনাথ। হরিজন আন্দোলনের এক

অসাধারণ দলিল 'চণ্ডালিকা' যারা ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছেন।

তবে আধুনিক নাট্যকারদের সঙ্গে সে যুগের নাট্যকারদের পার্থক্য অনেক। সেযুগে সে সময় "বাস্তব সমাজটিকে রঙ্গমঞ্চে এনে নিখুঁতভাবে উপস্থিত করে দিতে পারলেই সে কালের নাট্যকারদের দায়িত্ব শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু আধুনিক কালে এই নিতান্ত সহজ উপায়ে দর্শকের চোখ ভুলাইবার রীতি একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিমনের জটিলতা, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা—এই সকল নিপুণভাবে কথোপকথনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া লইয়া নাট্য চরিত্রের বিকাশ এই যুগে দেখাইতে হয়"।

এখনকার মানুষের মন জটিল, মানুষ আত্মসচেতন। ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ফলে সাহিত্যও জটিল হয়ে পড়েছে।

প্রাচীন যুগ হতে নাটকের প্রচলন। গ্রীসের নাট্যজগতের উজ্জ্বল তারকারা হলেন ইসকাইলাস (খৃঃ পূঃ ·২৫) সফোক্লিস (খৃঃ পূঃ ৪৯৫) এবং ইউরোপিডিস্।

গ্রীক দেশে খ্রীষ্ট জন্মের বহু আগে থেকেই ব্যাপকভাবে নাট্যচর্চা হোত। পরবর্তী যুগে এক জটিল পরিবেশের মধ্য দিয়ে উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের আবির্ভাব। গ্রীক নাটকের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নাট্য অন্দোলনের পথ। নাটকের মধ্যে যেভাবে গান বা 'বচন' পরিবেশিত হোত আজও যেন সেই স্রোত প্রবাহমান। অসাধারণ প্রতিভাধর নাট্যকার সেক্সপীয়ার এর নাটকের মধ্যে একটা জটিল যুগের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় ইসকাইলাস এর নাটকের মধ্যে, "টিমন অফ এথেন্সে" যে উপহার আমাদের দিয়েছেন তা সমাজ চিরকাল মনে রাখবে। "গ্লাউয়েস্টারের আঘাত দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকারের মধ্যে সেই যুগের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোকে রক্তরেখায় বর্ণময় হয়ে উঠেছে—

Love cools, friendship falls off, brothers divide; in cities, mutinies in countries, discord in places, treason, and the bond cracked twist son and father."

নগ্নলোভী, কুটিল ষড়যন্ত্রীময়ী যুগের মানবদরদী নাট্যকার

সেক্সপীয়ার।

মানুষের মনে যখন ধিক্কার অনুশোচনা, কিছু বলার আগ্রহ, কিছু করার অভিপ্রায় জাগ্রত হয়েছে তখন গড়ে উঠেছে সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্য রঙ্গমঞ্চ। জীবনের তাগিদেই হোক আর পেশার জন্যই হোক, জোয়ার এসেছে বীরভূমেও। বীরভূমের মাটিতে যে-ভাবে নাটকের গোষ্ঠীগুলো গড়ে উঠেছে—তা পেশাদারী হয়ে ওঠে নি। অনেক সময় দেখা গেছে কোন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বা ঈর্ষা এই গোষ্ঠীগুলোকে তৈরী করতে সহায়তা করেছে। বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শুভ সূচনা ১৮৭২ সালে। বাংলার জাতীয় জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের প্রভাব অপরিসীম। বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলায় যুগ চেতনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে গড়ে ওঠে ছোট ছোটে গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে নানা রকম মত পার্থক্য থাকলেও, সামাজিক আন্দোলনে অংশ নেয়। বীরভূমেও এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন মঙ্গল চৌধুরী। "মঞ্চকেন্দ্রম" নামে একটি গোষ্টীর মাধ্যমে তিনি বীর-ভূমের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে একটা সামগ্রিক নাট্য আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। বীরভূমের নাট্যচর্চা বা নাট্য আন্দোলনে যাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন লাভপুরের জমি-দার বংশের সন্তান নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা গেছে জমিদারদের মধ্যে গানের বা নাটকের চর্চা ছিল ব্যাপক। দুবরাজপুর, লাভ-পুর কীর্ণাহার প্রভৃতি জায়গায় নাটকের চর্চা ভালই হোত। হেতম-পুর রাজাদের তৈরী "রঞ্জন অপেরা" এখন যা "নবরঞ্জন অপেরা" নামে কলকাতা, তথা সারা বাংলায় যথেষ্ঠ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তবে সাধারণ সংগ্রামী মানুষ হিসেবে যাঁকে চিহ্নিত করি তিান হলেন মঙ্গল চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা।

" পথিক "—তুলসী লাহিড়ী

" বিসর্জন "—রবীন্দ্রনাথ

" ফেরারী ফৌজ „—উৎপল দত্ত।

বীরভূমে শহর কেন্দ্রীক নাট্য গোষ্ঠীগুলির অক্লান্ত পরিশ্রমে এখনও নাটক সজীব। এই সমস্ত নাট্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল—

॥ সিউড়ী ॥

১। আনন ২। এখনই ৩। থিয়েটার অভিযান ৪। আলাপণ ৫। মুক্তমন ৬। চিরন্তন ৭। জোনাকী ৮। ঋজুবাক্ ৯। কৃষ্টি-দীপ।

॥ লাভপুর ॥

অতুল শিব।

॥ রায়পুর হাট ॥

১। প্রবাহ নাট্যম ২। বীরভূম নাট্যকেন্দ্রম ৩। বীরভূম সংস্থা

॥ বোলপুর ॥

১। নাট্যসাথী ২। পাঞ্চজন্য ৩। অনামিকা

॥ আমোদপুর ॥

১। সাহিত্য সংবাদ ২। নাট্যতীর্থ

॥ সাঁইথিয়া ॥

১। ইয়ুথ কালচারাল ফোরাম ২। সার্বভৌম ৩। রূপতাপস ৪। নবচেতনা ৫। রঙ্গতীর্থ।

একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে বেশ কয়েকজন পাত্র-পাত্রীর দরকার হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা খুবই কম থাকলেও বেশ কিছু সাহায্যকারীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই গোষ্ঠীর আবির্ভাব। যদি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে না থাকে তবে পরিবেশনা অসম্ভব। আনুষঙ্গিক নানা উপকরণ জোগাড় করতে যেমন প্রয়োজন সাহায্যকারীর; তেমনি প্রয়োজন অভিনয়ের। বর্তমানে কলকাতার নামী দামী পেশাদারী সংস্থা কম টাকার মধ্যে নাটক পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে শহরে গ্রামে গঞ্জে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বীরভূমের নাট্য গোষ্ঠীদের পরিবেশনায় বাধা পড়ে নি। "নাটক সব সময়েই রাজনৈতিক হবে", কথাটা জোর দিয়ে বলা যায় না।

নাটক সমাজের দর্পণ। তবে সমাজের নানা রকম রূপ থাকে। এক একজন নাট্যকারের দৃষ্টি এক এক দিকে। এবং এক একটি রূপকে তুলে ধরেন। রাজনৈতিক নাটকের সংজ্ঞা নিরূপণ করা অসম্ভব। রাজনীতি বলতে কী বোঝায় সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে কোন মতবাদের উপর ভিত্তি করে নাটক রচনা হচ্ছে। বাংলা

নাট্য সাহিত্য দেখা যায়, বাংলার দিকপাল নাট্যকাররা অনেক সময় নির্দ্দিষ্ট কালকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। দ্বন্দ্বময় জীবনযাত্রায় মানুষে মানুষে ভেদ অপরিসীম। কখন সাম্প্রদায়িক, কখন ধনী দরিদ্রে সংঘাত প্রতিনিয়ত সমাজকে পরিবর্তনশীল করছে। নাট্যকার মন্মথ রায় "গোধূলি সংগীত" পত্রিকায় আত্মজীবনীতে লিখেছেন আজ থেকে সব নাটকই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে লেখা হোক। কিন্তু বক্তব্য হল সবাই কেন মেনে নেবে। শ্রেণী সংগ্রামে ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা তো মন্মথবাবুর মতবাদ মানতে পারবেন না। নাটক, উপন্যাস, গল্প সব সময়েই সার্বজনীন হওয়া আবশ্যক। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে কোন বিশেষ মতবাদের উপর নাটক বা জলো প্রহসন সাময়িকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

নাটক সব সময়েই হবে স্বতঃস্ফুর্ত্ত। তার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দিকগুলো ফুটে উঠবে। দর্শক বুঝতে পারবেন তাঁর ভুল। দর্শক গ্রহণ করবেন উপযুক্ত শিক্ষা। নাটক কোন সময়েই ফ্লাটারার হবে না। বীরভূমে পরিবেশিত নাট্য ধারায় কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। সব সময়েই দেখা যায় অনুকরণশীল।

বীরভূমে ভাল নাট্যকারেরও অভাব। অভাব দক্ষ অভিনেতার। সর্বোপরি পরিচালক এবং অর্থ। একটা নাটককে সার্বজনীন করতে হলে আগে দরকার বিষয়। ভাল প্লটের উপর নাটকটি রচিত হতে হবে। এর জন্য দরকার নাট্যকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টি। তার পর জন মনে দাগকাটার মত অভিনেতা। যেমন ভাল ভাল খাবারের উপকরণ থাকলেও রাঁধুনি অভাবে খাবারের টেষ্ট আলাদা হয়। তেমন ভাল প্লট থাকলেও অভিনেতার অভাবে নাটক জনমনে দাগ কাটতে পারে না। তৃতীয়তঃ অভিজ্ঞ পরিচালক প্রয়োজন। যিনি আসলে নাটক বোঝেন।

বীরভূমে 'আমন' গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছুটা গতিশীলতা আছে। প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় 'আমন' বীরভূমে উজ্জ্বল।

সাক্ষরতা

বীরভূম জেলাকে সাক্ষর জেলা হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্পে ১৯৯০ সালে অক্টোবরে গঠিত "বীরভূম জেলা সাক্ষরতা সমিতি"। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বামফ্রন্ট সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে 'সাক্ষরতা আন্দোলনে'। প্রথম শুরু হয় মেদিনীপুর জেলায়, পরে বর্ধমান। এরপর হুগলী তারপর বীরভূমে।

বীরভূম জেলায় সাক্ষরতা সমিতির উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাপতি শ্রীব্রজ মুখার্জী যাঁর ভূমিকা ছিল কাণ্ডারীয় মতো। এছাড়া ছিলেন জেলা শাসক বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীনিকেতনের পল্লীর সংগঠণ বিভাগের অধ্যক্ষ, বিধায়কগণ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ।

"১৯৮১ সালে আদমশুমারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী বীরভূম জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৪%; আর সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ৯ থেকে ৫০ বছরের অধিবাসীদের মোট ৭ লক্ষ হল নিরক্ষর।

বীরভূমে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কয়েকটি লক্ষ্য ছিল বা এখনও সেই লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবীগণ কাজ করে চলেছেন ঃ

(ক) ৫-৮ বছরের সমস্ত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকদের বাধ্য করা।

(খ) ৯-১৪ এবং ১৫-৫০ বছরের সমস্ত নিরক্ষরকে ৫ বছরের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা

(গ) পরবর্তী পর্যায়ে বয়স্ক নবাক্ষরদের জন্য পুস্তিকার সাহায্যে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) সাক্ষরতার সাথে প্রত্যেক নবসাক্ষরকে জনস্বাস্থ্য পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতার বৃদ্ধি সাধন।

প্রকৃত নিরক্ষর কতজন আছেন এবং অন্ততঃ প্রতি দশ জনের পিছনে একজন করে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সাক্ষরতা সমিতি। নিরক্ষর গণনার কাজ পঞ্চায়েতের হাতে পড়ে।

অতঃপর স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ এর দায়িত্ব গ্রহণ পঞ্চায়েতের উপর পড়ে। এ ব্যাপারে বীরভূমে কোন স্বেচ্ছাসেবীকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নি। যৎসামান্য টিফিন দেওয়া হয়েছিল।

গ্রাম পঞ্চায়েত সাক্ষরতার কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন করেছিল। সর্বস্তরের এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের ও শিক্ষক মহাশয়দের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। জেলাস্তরে বা ব্লকস্তরেও এই কমিটি ছিল। ব্লকের এক-জন আধিকারিকের (E.O.) উপর এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল।

সাধারণতঃ প্রাথমিক স্কুল বা কোন ব্যক্তির বাড়ীর উঠোনে বসে পড়ানো হোত। এ বিষয়ে কতগুলো সমস্যা দেখা দিয়েছিল ঃ

প্রথমতঃ, যারা স্বেচ্ছাসেবী ছিল তারা সাধারণতঃ ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে গরীবদের প্রতি ছিল উন্নাসিক বিতৃষ্ণা।

দ্বিতীয়তঃ, ট্রেনিং দেওয়ার সময় স্বেচ্ছাসেবকদের ধারণা ছিল 'কিছু' পাব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম! ফলে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যমে কিছুটা ভাটা পড়ে।

তৃতীয়তঃ, অনেক পড়ুয়ার ধারণা ছিল আমাদের পড়িয়ে ওমুকবাবুর ছেলে চাকরী পেয়ে যাবে, বা টাকা পাবে, এই ধরনের ধারণার ফলে পড়ুয়ারা বেঁকে বসে।

কিন্তু জেলা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত যৌথভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে বাধা অনেকটা দূর হয়। ভারতবর্ষে যখনই কোন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে তখনই দেখা গেছে নানা বাধা এসেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ দিতেন বা রামমোহন রায় সতীদাহের বিরোধিতা করতেন বিরোধীদের চরম বাধার সম্মুখীন হতে হোত তাঁদের। কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকে নি। সাক্ষরতা আন্দোলনও তাই থেমে যায় নি। স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বার্থটাই সবচেয়ে বড়। তবুও কেউ এগিয়ে আসেন সমাজ গঠনের কাজে। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি একদিন মল্লারপুর হাইস্কুলে সর্বদলীয় সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন "আপনারা আপনাদের লোকদের শিক্ষিত করে তুলুন। তাহলেই দেখবেন বীরভূম সাক্ষর হয়ে গেছে, এবং এটা আপনাদের নৈতিক

(ক) নবসাক্ষরদের পড়াশোনা এবং অঙ্কে আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করা।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা এবং কারিগরী জ্ঞান অর্জনে সহায়তা।

(গ) পরিবেশ রক্ষণ, নারীর সম-মর্যাদা, ছোট পরিবারের উপযোগিতা উপলব্ধি।

(ঘ) বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে যোগদান এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

(ঙ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা।

বিশ্বের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলো কিন্তু সাক্ষরতার উপর ব্যাপক জোর দিয়েছিল। কোন কোন দেশ আইন করেও সাক্ষরতা আন্দোলনে সামিল করেছিল কর্মচারীদের। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারেরও দৃষ্টি কিন্তু সাক্ষরতা আন্দোলনের উপর। নিরক্ষরতা সমাজের লজ্জা। গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথও একথা উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্য আজ অনেকটা সরব। কেরালায় সাফল্য অন্যান্য রাজ্যগুলোর চক্ষুদান করেছে। তবে এই আন্দোলনে একদিনে সফলতা আসে না। চলতি কথায় বলে লেগে থাকা। এই লেগে থাকলে মরিচা পড়ে না। বীরভূমের মানুষ লেগে আছে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিরক্ষরদের নিয়ে আসতে। এরজন্য বীরভূমের ১৯টি ব্লক এবং জেলা ও মহকুমার কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। এই আন্দোলন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল নানা স্লোগান, পোষ্টার, নাটক, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে হয়েছিল মিছিল। যাতে করে মানুষ অনুপ্রেরণা পায়। পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর বীরভূম পূর্ণ সাক্ষর জেলা হিসেবে ঘোষিত হলেও বীরভূম নব পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এখনও "দিকে দিকে দিচ্ছে ডাক ; নিরক্ষরতা নিপাত যাক।"

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জন্ম এবং শিক্ষার শতকরা হার দেওয়া হল 1991.

		জনসংখ্যা	জন্মহার	শিক্ষা	স্ত্রীশিক্ষা	শিশুমৃত্যু
১।	চীন	১১৩'৬৪	২'৪	৭৩'৫	৬'২	৩
২।	ভিয়েতনাম	৬'৭১	৩'৯	৮৭'৮	৮৪	৪'৯
৩।	ভারতবর্ষ	৮৫'৫৫	৪'২	৫২'১১	৩৯'৪২	৯
৪।	বাংলাদেশ	১১'৬	৫'৩	৩৫	২২	১১'৬

জাপানে স্ত্রী শিক্ষার হার ৯৯% এবং থাইল্যাণ্ডে ৯০%। থাইল্যাণ্ডে শিশু মৃত্যুর হার ২'৬%

গ্রন্থসূচী

১। বীরভূমের ইতিহাস (দুইখণ্ড)—গৌরীহর মিত্র।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩। চন্দ্রভাগা—বীরভূম সংখ্যা—(১৯৮৯)—রমানাথ সিংহ সম্পাদিত।

৪। রাঢ়ের পূর্বপুরুষ ও পূজা—ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

৫। টেম্‌পল্‌স অফ্‌ বীরভূম—সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। কলেশ্বর ও কলেশনাথ—শুকদেব মিত্র

৭। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

৮। বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি—দেবকুমার চক্রবর্তী

৯। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস—
ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী

১০। তীর্থময় বীরভূম—মুক্তিপদ দে

১১। ট্রাজেডি তত্ত্ব ও নাটক—ডঃ শীতল ঘোষ